জলে দেখি জোনাকি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক

সুনীল মণ্ডল

৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট

গৌতম রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ইম্প্রেসন্ হাউস

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা-৯

মুদ্রক

শ্রীবংশীধর সিংহ

বাণী মুদ্রণ

১২ নরেন সেন স্কোয়ার

কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

পরমকল্যাণীয়া বধূমাতা

শ্রীমতী অর্চনা রায়

সাবিত্রীসমানেষু

১

বেলেঘাটা থেকে ডায়মণ্ডহারবার-বজবজ-এর দিকে যে রেল লাইন সোজা দক্ষিণে চলে গেছে, তারই কাছাকাছি ওদের বাস।

একদিকে ইটিলী আর একদিকে গোবরা।

প্রবীররা বলে আমরা ইটিলীতে থাকি, ইটিলীর বনেদী বাসিন্দারা তা স্বীকার করে না। বলে, 'ওটা-আবার ইটিলী হল কবে থেকে?'

এতেই পাড়াটার অবস্থা ও অবস্থান অনুমান করে নিতে পারবেন অনায়াসে।

বস্তিই বেশির ভাগ।

পাকাবাড়ি যে নেই তা নয়, হয়ত সংখ্যায় তারাই বেশী, কিন্তু বস্তি বা ঐ ধরনের বাসগৃহই অনেকটা জমি জুড়ে আছে।

লাইনের এদিকের বস্তি অনেকটা ভদ্র। টিনের দেওয়াল টিনের চাল, অথবা পাকা-দেওয়াল টিনের চাল।

ওদিকের মতো মাটির ঘর, খাপরার চালের বস্তি এদিকে নেই বললেই হয়।

প্রবীরের বাসাটা বড় একটা বস্তির ধারে হলেও সে ব্যারাক-বাড়ির অন্তর্গত নয়—অর্থাৎ বহুজনের বাস নয়, সরকারী কলে জল নিতে হয় না কিংবা পায়খানায় 'কিউ' দিতে হয় না।

স্বতন্ত্র ছোট বাড়ি, একতলা হলেও বেশ পোতা-উঁচু, ইংরিজী 'এল' অক্ষরের মতো আকৃতি; চারখানা ঘর, তার দুটিতে থাকে বাড়ি-ওয়ালারা, বাকী দুটি প্রবীরদের ভাগে।

দুখানা বলা অবশ্য ভুল—দেড়খানা বলাই উচিত।

প্রবীরের মা যেটাতে থাকতেন সেটা নিতান্তই সংকীর্ণ, একজনেরও নড়াচড়া করার মতো যথেষ্ট স্থান নেই তাতে।

ঘরগুলো ইটের দেওয়াল টিনের চাল; ইলেকট্রিকও আছে—কিন্তু রান্না-ঘর সবটাই টিনের।

ঘর থেকে আল্‌গা তার টেনে নিয়ে গিয়ে সেখানে আলো জ্বালতে হয়।

রীতিমতো কোন লাইন টানার মতো জায়গা নেই।

কলঘর পায়খানা একপ্রস্থ। ভাড়াটে বাড়িওয়ালা উভয়েরই ব্যবহার্য। এরই ভাড়া পঞ্চান্ন টাকা। আলো বাবদ আরও সাড়ে সাত টাকা বেশী।

তাও বলা কওয়া আছে, চল্লিশ-বাতির বেশী আলো ব্যবহার করা যাবে না কোন ঘরে।

বছরে একমাস পরীক্ষার খাতা দেখার সময় একটু বেশী জোর আলো দরকার হয়।

সেটাও বলা আছে, ষাট বাতির বাল্‌ব লাগায়—সেজন্যে একটি টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়।

দীনহীন—প্রায় হত-দরিদ্রের মতো বাস করা।

অথচ এখানে এতখানি কষ্ট করে বাস করার মতো অবস্থা ঠিক প্রবীরদের নয়।

অন্ততঃ ওর মায়ের তাই ধারণা।

তবু তো, ওর সঠিক আয় কত তা তিনি জানেন না।

ইস্কুল-মাস্টার ঠিকই, তাও বড় কোন সরকারী ইস্কুলের নয়—ট্যাংরায় এক মাঝারি দরের বেসরকারী ইস্কুলে মাস্টারী করে প্রবীর, তবু সকাল বিকেল দুটো টিউশনী, পরীক্ষার খাতা দেখা, স্ক্রুটিনি—পাঠ্য-পুস্তক বা অর্থ-পুস্তকের প্রুফ দেখা ইত্যাদি—সব মিলিয়ে গড় আয় মাসে পাঁচ-

শোরও বেশী।

সুতরাং আর একটু ভাল বাড়িতে, কোন পাকা বাড়ির ছোট ফ্ল্যাটে একশো টাকা বা ঐ রকম ভাড়ায় যে থাকতে পারত না তা নয়।

প্রবীরের মা শৈবলিনী দেবীর বিশ্বাস, তাঁকে জব্দ করার জন্যেই ছোট ছেলে এখানে এনে তুলেছে।

এই দৈন্যদশায়, এই বস্তির মধ্যে।

এ নিয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছেন তিনি, অনেক বিলাপ এবং অনেক খেদোক্তি।

অনেক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন ছেলের উদ্দেশে।

কিন্তু প্রবীরের ঔদাসীন্যের বর্ম ভেদ করে তার মর্মে পৌঁছতে পারে নি তা।

সে অবিচলিতই থেকেছে।

আগে ওরা থাকত ট্যাংরা অঞ্চলেই, দেড়শো টাকা ভাড়ায়।

অনেক আগেকার ভাড়া—কর্তার আমলে একশো টাকায় নিয়েছিলেন তিনি, সেটাই বাড়তে বাড়তে দেড়শোতে দাঁড়িয়েছিল।

সে সময় ও-অঞ্চলে একশো টাকায় বিরাট বাড়ি পাওয়া যেত; হাত-পা মেলে থাকতেন তাঁরা, সেই ভাবেই থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বরং মাঝে মাঝে মনে হ'ত—বাড়িটা আর একটু বড় হলে মন্দ হত না।

কর্তা মারা যেতেও অসুবিধা হয় নি, কারণ প্রবীরের দাদা সুজিত ভাল বিলিতী ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়েছিল, বাড়ির ভাড়া কে দিচ্ছে, কত দিচ্ছে, কমানো দরকার কি না তা নিয়ে কারও মাথা ঘামাবার খুব প্রয়োজন হয় নি।

তারপর এক সময়—যথাসময়েই—সুজিতের বিয়ে হল।

এখনকার রীতি-মাফিক প্রেমের বিয়ে ঠিক বলা না গেলেও আলাপ-

পরিচয়ের বিয়ে তো বটেই।

আপিসের এক বন্ধুর বোন মিত্রা। সুন্দরী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী। স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার সমস্ত গুণ নিয়েই সে এসেছিল। সে জানে তার স্বামীর কত আয়। ফলে এখানে এসে যখন সে দেখল যে তার দেওর মাসে মাত্র দুশোটি টাকা দাদার হাতে তুলে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ও আত্মসন্তুষ্ট থাকে—তখন সে স্বভাবতই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠল এবং নির্বোধ স্বামীকে পরিচালিত করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হ'ল।

নেওয়াই উচিত, তার দিক—তাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে।

ভাইদের চোখে দীর্ঘদিনের যে অভ্যস্ত প্রীতি ও স্নেহের অঞ্জন থাকে —সাহচর্য সম্বন্ধে স্বাভাবিক আকর্ষণ, বৌদের তা থাকার কথা নয়। তাছাড়া তাদের সংসার, তার সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তা সে করবে বৈকি। সেজন্যে কোন দোষ দেওয়াও যায় না।

প্রথম প্রথম সুজিত এ ব্যবস্থা সহজে মেনে নেয় নি, বিদ্রোহ করার—প্রতিপরিচালনার চেষ্টা করেছিল।

তারপর সম্ভবতঃ তারও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়েছে।

ভঙ্গুর মাটির কলসীও কুয়াতলার কঠিন পাথরে নিত্য বসাতে বসাতে গর্ত হয়ে যায়—বোপদেবের জ্ঞানোন্মেষের সে কাহিনী মিতার না-জানার কথা নয়, অথবা জানার প্রয়োজন হয় নি, তার সহজাত বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাসেই ধৈর্যের সঙ্গে একটু একটু করে এগিয়ে গেছে সে। এসব পাঠ পাঠশালার পুঁথি থেকে নিতে হয় না, প্রকৃতিই এ পাঠ দেন, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেয় মেয়েরা। ভগবানই এইভাবে ওদের তৈরী করে পাঠান। এটুকু স্বার্থবুদ্ধি না থাকলে সংসার রক্ষাও হয় না বোধ করি।

কারণ যাই হোক, ফলটা সুপ্রত্যক্ষ।

চক্ষুলজ্জা ও স্বার্থবোধ—এ দুয়ের মধ্যেও একটা সমন্বয় করা গেল।

সুজিত তদ্‌বির-তদারক করে দিল্লীতে বদলি হয়ে গেল।

এখানে ভালরকম কৈফিয়তেরও অভাব হল না।

বদলি সে স্থায়ীভাবেই হচ্ছে, তার বদলে কোম্পানি তাকে কিছু বেশী মাইনে এবং কম ভাড়ায় ভাল কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

এতখানি সুবিধা কি ছাড়া উচিত?

নিজের উন্নতির চেষ্টা সকলেই করে, খুব নির্বোধ না হলে সে সুযোগ ছাড়ে না। সুজিত যদি সেইটেই করে থাকে—কারকি বলবার আছে?

যতদূর সম্ভব মিষ্টি ও মোলায়েম করেই খবরটা দিল সুজিত।

সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিল যে এ ব্যবস্থায় সে সম্মতি দিয়ে দিয়েছে—এর নড়চড় হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই।

সে-ই প্রথম ধাক্কা খেল প্রবীর।

সেও গ্র্যাজুয়েট। বরং দাদার থেকে বেশী, একটা সেকেণ্ড ক্লাস মাস্টার ডিগ্রিও আছে তার।

দাদার থেকে সে চিরদিনই ভাল ছাত্র ছিল।

দাদা সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, প্রবীরের অনার্স ছিল।

চেষ্টাচরিত্র করলে কোন বিদেশী ফার্মে না হোক, সরকারী আপিসে একটা চাকরি যোগাড় করে নিতে পারত।

পড়াতে ভাল লাগে বলেই এই কাজ বেছে নিয়েছিল।

কোনদিন যে আয়ের কথাটা ভাবতে হবে, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা করতে হবে, সবচেয়ে বড় কথা—একা নিজের দায়িত্বে সংসার করতে হবে—এ কথাটা মাথাতেই যায় নি এতকাল।

দাদার এই স্থায়ী বদলির সংবাদে হঠাৎ যেন পায়ের নিচের মাটি সরে গেল তার, চোখে অন্ধকার দেখল।

বিমূঢ়ভাবে শুধু প্রশ্ন করল, 'কিন্তু মা—?'

'মার যদি এখানে থাকা একান্ত না পোষায়, আমার কাছে গিয়েই

থাকবেন', শুষ্ক উদাসীন কণ্ঠে জবাব দিল সুজিত, 'তবে এতকাল তো আমি তাঁর ভার বইলাম, এবার তো তোমারই বওয়া উচিত। মা তো আমার একার নয়—তুমিও তো তাঁর ছেলে।'

আর কিছু বলে নি প্রবীর।

দাদার মনোভাব না বোঝার কোন কারণ নেই!

বরং আগেই বোঝা উচিত ছিল। বোঝা এবং সতর্ক হওয়া।

পরিবর্তনটা বহুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে সে।

দাদার কথাবার্তার ক্রম-বিবর্তন।

সেই সঙ্গে বৌদির মালিকানা মনোভাবও।

কার্যকারণ যোগাযোগটা সুস্পষ্ট।

তবে তাঁর চেষ্টার ফলটা যে এত শীঘ্র ফলবে আর এমন ভাবে, সেইটেই বুঝতে পারে নি।

সময়ের হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিছল।

তবে—ভাল ঘোড়ার এক চাবুকই যথেষ্ট—এ প্রবাদের যাথার্থ্য প্রবীরের বেলায় আর একবার প্রমাণিত হল।

দাদা চলে গেলে খালি বাড়িতে প্রবীর অঙ্ক কষতে বসল।

তার বর্তমান আয়; কতদূর পর্যন্ত বাড়তে পারে; মৃত্যুকাল পর্যন্ত কত আয় থাকা সম্ভব; আরও কী কী পরিশ্রমে কতটা আয় বাড়ানো যায় — এবং সে বাড়তি পরিশ্রম স্বাভাবিক অবস্থায় কতদিন পর্যন্ত করতে পারবে; বর্তমান দায়দায়িত্ব—মা কতদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারেন; তাঁর ও নিজের অসুখবিসুখের প্রশ্ন; ভবিষ্যতে যদি নিজে সংসার করে তার আনুমানিক খরচ—এবং তার জন্য এখন থেকে কতটা সঞ্চয় করা উচিত; সমস্ত খতিয়ে হিসেব করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছল যে জীবন-যাত্রার ব্যয় বা মান কঠোরভাবে—ইংরেজীতে যাকে বলে 'ড্রাস্টিক্যালি'

কমিয়ে ফেলা উচিত।

আর তা কমাতে গেলে বাসস্থানের মানও কমাতে হবে, তা নইলে মার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না।

এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা বদলাতে পারবেন না তিনি।

এই পুরাতন পরিবেশে জীরনযাত্রার দীন উপকরণ ও পদ্ধতি অধিকতর আঘাত করবে তাঁকে।

পরিবর্তনটা বেশী বাজবে চোখে।...

তবু ভাবতে ভাবতে এবং মন স্থির করতে করতে মাসখানেক কেটে গেল বৈকি।

মার কাছে প্রস্তাবটা পাড়তেও সময় লাগল, নিজের চিন্তাকে নিজের কাছে সম্ভব ও বাস্তব করে তুলতেও।

কিন্তু ইংরেজী মাসের আট তারিখের মধ্যেও যখন দিল্লী থেকে কোন মনি-অর্ডার কি কোন চিঠি এল না, তখন সে সমস্ত জড়তা পরিহার করে প্রবল-ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল।

অনেক খুঁজে এই বাড়ি সংগ্রহ করল এবং যেহেতু এখানে অত বড় বাড়ির সব মাল ধরানো সম্ভব নয়, সেহেতু নির্মমভাবে সব বিক্রি করে দিল, এমন কি বাবার ব্যবহৃত খাটটা পর্যন্ত।

ওর নিজস্ব একটা 'একানে' খাট ছিল, মার কষ্ট হবে বলে সেইটেই তাঁর জন্য রেখে দিল, নিজের জন্যে একটা সাধারণ একটু বড় মাপের তক্ত-পোশ কিনে এনে নতুনভাবে দরিদ্রের গৃহস্থালি পেতে বসল।

বোধহয় মাকে বোঝাতে আর বিশ্বাস করাতেই ব্যবস্থা আরও বেশী কঠোর করতে হল।

হয়ত নিজেকে বিশ্বাস করাতেও।

বলা বাহুল্য মা ঘোরতর রকমের প্রতিবাদ করেছিলেন এ ব্যবস্থায়।

প্রথমটা তো বিশ্বাসই করতে চান নি,তারপর যখন বুঝেছিলেন যে এটা তামাশা নয়—কঠিন বাস্তব সত্য, তখন একেবারে বেঁকে বসেছিলেন।

মান-অভিমান, কান্নাকাটি, কপাল-চাপড়ানো—যতরকমে সম্ভব প্রতিরোধ করেছিলেন।

তার কারণ, প্রধানতঃ এটাকে তাঁর সামাজিক আত্মহত্যা বলে মনে হয়ে-

রাজরানী থেকে ভিখারিনীর স্তরে নেমে আসা ছাড়া একে আর কি বলা চলে ?

এর পর পরিচিত সবাই কি গায়ে থুতু দেবে না—করুণার চোখে. অবজ্ঞার চোখে দেখবে না ?

এর চেয়ে যে সোজাসুজি আত্মহত্যাও ভাল।

এ কী পাগলামি করছে ছোট খোকা !

না না, এসব দুর্বুদ্ধি ছাড়ুক সে।

কিন্তু প্রবীর দুর্বল কি বিচলিত হয় নি।

দুর্বল হলে তার চলবে না এটা বেশ বুঝে নিয়েছিল।

সে পরিষ্কার মাকে বলেছিল, 'আমার কাছে যদি থাকতে হয় এইভাবেই থাকতে হবে, এর থেকে বেশী আমার সাধ্য নেই। ধারদেনা করে বাইরের ঠাট বজায় দিতে পারব না। আমি গরিব ইস্কুল মাস্টার—আমাকে কে কতদিন ধার দেবেই বা ? এতে যদি তোমার না পোষায়, দাদার কাছে চলে যাও। বলো তো দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

অন্য কোন যুক্তিতে হয়ত হ'ত না, এই শেষ অস্ত্রনিক্ষেপেই কাজ হয়েছিল।

চুপ করে যেতে হয়েছিল শৈবলিনীকে।

গত দুবছরে পুত্রবধূর মেজাজের চেহারাটা তিনি দেখে নিয়েছিলেন।

সে-ই যে মালিক, তার স্বামীর রোজগারেই যে এ সংসার চলছে—সে সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন।

তার স্বামীকে বোকা পেয়ে দোহন করছে এরা—নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে দিচ্ছে না। আত্মীয় নয় শত্রুর কাজই করে এসেছে এতদিন—একথাটা আকারে ইঙ্গিতে ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভেতরে ভেতরে সংসার ভেঙে দিয়ে পৃথক হয়ে অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা করছিল, আর, শীগ্‌গিরই সেটা হয়ে যাবে জানত বলেই—একেবারে দূর-দূর করে দেওর-শাশুড়ীকে তাড়িয়ে দেয় নি এতদিন।

এখন নিজে থেকে যেচে সেখানে বাস করতে গেলে সেই গলাধাক্কাই হয়ত খেতে হবে।

নইলে দাসীবাঁদীর মতো মাথা হেঁট করে থেকে অপমানের ভাত তুলতে হবে মুখে।

দাসীবাঁদীর কাজই হয়ত করিয়ে নেবে।

সে সংসারে গিয়ে ঝিয়ের মতো খাটলে হয়ত তাদের অতটা আর গায়ে লাগবে না।

ভবিষ্যতের এই সম্ভাব্য চেহারাটা দেখেই চুপ ক'রে গিয়েছিলেন।

তবু বিলাপ এবং প্রবীরের কৃপণতাকে কটাক্ষ করে বাঁকা কথা বলা একেবারে বন্ধ হয় নি—সেটা হল মাসকতক পরে, যখন পুজো এল এবং চলে গেল—না এল বড় ছেলের কাছ থেকে একটা টাকা, না এল একখানা প্রণামী চিঠি।

একেবারে কালীপুজো নাগাদ মিতার একখানা চিঠি পাওয়া গেল, 'খোকনের জ্বর এবং অন্য ঝঞ্ঝাটে ব্যস্ত থাকায় চিঠি দিতে দেরি হইল, আশা করি মনে কিছু করিবেন না। আমাদের ৺বিজয়ার প্রণাম লইবেন, ছোড়দাকে আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—'

চিঠির মধ্যে কোন কুশল প্রশ্ন নেই, টাকাকড়ি এমন কি একখানা পুজোর কাপড় পর্যন্ত কেন পাঠাতে পারল না—সে কথারও কোন উল্লেখ নেই।

যতই যা হোক—ঠিক এরকম আশঙ্কা করেন নি।

এতদূর কল্পনা পৌঁছয় নি তাঁর এত দুঃখের পরও।

এইবার একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন শৈবলিনী।

আর একটি কথাও বলেন নি কখনও—'ছেলেদের হাতে পড়ে তাঁর কী খোয়ার হচ্ছে, আরও কি বাকী আছে, এরপর হয়ত লোকের বাড়ি দাসীবৃত্তি করতে বেরোতে হবে কিংবা কালীঘাটে গিয়ে আঁচল পেতে বসতে হবে ভিক্ষের জন্যে'—এধরনের কথা আর কখনও শোনা যায় নি তাঁর মুখে।

এ ধরনের কথা বলার লজ্জা এতদিনে ধরা পড়েছে তাঁর কাছে।

এর অন্তর্নিহিত অপমান।

শুধু মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসত আপনা-থেকেই, তাও যতদূর সম্ভব সেটা সন্তর্পণেই ফেলতেন, যাতে ছেলের কানে না যায়!

আজ মনে হয় প্রবীরের—এমন চুপ করে না গেলেই ভাল হত বোধ হয়।

এই মন-গুমরে থাকার ফলেই, দাদার কাছে এই শেষ আঘাতে স্তব্ধ হয়ে যাবার ফলেই—দেহটা এমন করে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ হয়ে গেল, এত অকালে ঘুণ-ধরা কাঁচা কাঠের মতো এমন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল।

২

কিন্তু এই সামান্য গৃহস্থালির মধ্যে এসেই সুনেত্রার যেন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

রূপকথায় সেই দুয়োরানীর কন্যার মতো অবস্থা হয়েছিল তার।

ভাঙ্গা পর্ণকুঠির থেকে রাজপ্রাসাদে আসার মতো অভিজ্ঞতা।

ঘর সামান্য, আসবাব আরও অকিঞ্চিৎকর। তবু সাজানোর মধ্যে কিছু পারিপাট্য ছিল।

ছিল কিছু রুচিবোধ।

এতটুকুতেও অভ্যস্ত নয় সুনেত্রা, এও তার কাছে অবস্থাপন্ন সংসারের লক্ষণ।

মার্জিত শিক্ষিত রুচির সঙ্গে এর আগে তার কোন পরিচয় ঘটে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের রুচিতে যে তফাৎ হয়—অল্প আয়েও যে কেউ সুন্দর ভাবে ঘর সাজাতে পারে—এসব কথা সে জানত না, জানার কথাও নয়।

সে কেবলই তার আয়ত চোখ আরও বিস্ফারিত করে চেয়ে চেয়ে দেখে, সস্তার ফুলদানীটাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কত দাম জানতে চায়, বিছানার ওপর চাদর থাকা সত্ত্বেও আর একটা বেডকভার কেন লাগে—প্রশ্ন করে।

রাতে শুয়ে স্বামীকে বলে, 'তোমরা তো বড় লোক বাবা। দয়া করে গরীবের মেয়েকে নিয়েছ এই ঢের—আমার বরাত জোর, বরাতে সুখ ছিল, তাই।'

এখানে আসার সময় যে তক্তপোশটা কিনেছিল প্রবীর তা একজনের পক্ষে একটু বড়ই, কারণ ওখানে যে খাটে শুত, সেই মাপেই একাধিক তোশক ছিল—তার এবং দাদার আইবুড়ো বেলার বিছানা—সেগুলো ফেলে নতুন বিছানা কেনার চেয়ে তক্তপোশটাই একটু চওড়া কেনা ভাল এই হিসেবেই এটা কিনেছিল।

গদিও ছিল আগের আমলের ঐ মাপের।

সে গদি ও একখানা তোশক মাকে দিয়ে বাকী দুখানা তোশক নিজের চৌকিতে পেতে নিয়েছিল।

বিছানাটা একজনের পক্ষে বড় হলেও দুজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, তবু প্রবীর এখনই বড় খাট কি চৌকির ব্যবস্থায় যায় নি।

বিবাহের সঙ্গে নূতন শয্যার এক রকম অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ; ওরও মনে যে কথাটা আসে নি তা নয়, ও সে চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় নি।

এত খরচের মধ্যে আবার এতটা বাড়তি খরচের প্রয়োজন কি, না হয় একটু কষ্টই হবে।

নব-বিবাহিত দম্পতি ঘনিষ্ঠ হয়ে শোবে সেইটেই তো আশা করা উচিত।

নতুন বিছানা কেনে নি, সে জন্যে একটু সঙ্কুচিত ছিলই মনে মনে, কিন্তু এই বিছানায় শুয়েই অবাক্ হয়ে যায় সুনেত্রা।

টিপে টিপে দেখে বলে 'বিছানাটা কী নরম। সত্যি,আমরা যে বিছানায় শুই তা এর চেয়ে মোটা তো—কিন্তু কী শক্ত, যেন মনে হয় ইটের ওপর শুচ্ছি।'

কেন যে অত শক্ত তা প্রবীর জানে, দেখেছে সে।

'টু হিজ কস্ট'—ইংরেজীতে যাকে বলে—যে জ্ঞান লাভ হয়েছে তার।

বিয়ের রাতে সেইরকম বিছানাতেই রাত কাটাতে হয়েছে তাকে।

কাঠিন্যের কারণটাও তখনই বুঝেছে।

বছরের পর বছর ধরে কাঁথা তৈরি হয়েছে ছেঁড়া কাপড়ের।

স্থানাভাবে বিছানাতেই স্তূপীকৃত হয়েছে সেগুলো। নিত্য তার ওপরই শোওয়া-বসায় ফলে কাঁথাগুলো চিপটান খেয়ে গেছে,তার মধ্যে কোথাও একটু ফাঁপানো তুলোর চিহ্ন নেই। নরম হবে কেন?

কারণটা জানে কিন্তু স্বাভাবিক সঙ্কোচেই বলে না সুনেত্রাকে।

দরিদ্রের মনোভাব, তার লজ্জা সে আগেও জানত—এখন আরও বেশী করে বুঝেছে কে।

ওদের দারিদ্র্যের চেহারাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় না। বলতে হয়ও না কিছু, স্বামীর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে সুনেত্রাই বলে, 'সত্যি, এরকম ঘর-বর যে তো পাব—কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি। সে অবস্থাও নয় মেসোমশাইয়ের। তুমি দয়া করে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে ঘরে তুললে তাই। নইলে কে নিত—পাওনা তো নেইই—উল্‌টে ঘর থেকে টাকা খরচ করে? বিয়ে যে কোনদিন হবে তাই তো আশা ছিল না, হলেও বড়জোর কোন বিড়ি-অলা কি পানঅলার সঙ্গে, খুব জোর হয় তো কোন কারখানার কুলী।. চিরদিন মাসীর মুখ থেকে শুনেও আসছি তাই। বলে, 'এর চেয়ে বেশী আর কি জুটবে তোদের, যেমন বরাত করে এসেছিস তেমনি তো হবে। নেশাভাঙ করে এসে ধরে ধরে পিটবে, লাথি মেরে মাজা ভেঙে দেবে—আবার উঠে সেই ভাতারের জন্যেই ভাত রাঁধতে বসতে হবে।'

একটু থেমে আবার হয়ত বলে, 'মেয়েরা কত কী করে ভাল বর পাওয়ার জন্যে। শিবপুজো, পুণ্যিপুকর—কত বের্‌তো-পুজো। আমি তো কিছুই করিনি। কে করাবে বলো, চারগণ্ডা পয়সাও তো বাড়তি খরচ করার উপায় নেই মাসীর। তবু তোমাকে পেলুম কেন বলো তো! গেল জন্মে বোধহয় অনেক পুজো-বের্‌তো করেছিলুম, তাই না।

তৃপ্ত হয় প্রবীর, তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুনেত্রাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরে।

ভুল করে নি সে হিসেবে, ঠিকই করেছে।

এ পর্যন্ত তার কোথাও কোন হিসেবে ভুল হয় নি।
অথচ এর জন্যে লোকে কত কথাই বলেছে, এই অদ্ভুত বিয়ের জন্যে অনেকেই পাগল ভেবেছে তাকে।

মা ভেবেছিলেন তাঁর ছেলের কাণ্ডকারখানাতে আর নতুন করে অবাক হবার কিছু নেই।
এই বিয়ের প্রস্তাবে সে ধারণাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নতুন করেই অবাক্ হয়েছিলেন।
ইদানীং, গত দু বছর ধরে টাকাকড়ি খরচের ব্যাপারে একটি কথাও বলেন নি কখনও ছেলেকে। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে দেখে তিনিও চুপ করে থাকতে পারেন নি।
তাঁর নিজেরই ভাষায় গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গাল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আবারও।
বলেছিলেন, 'তা এত তোর হিসেব, এত অভাব, টেনে টেনে চলিস-- কারণকম্মি করে—আব ঘর থেকে সব খরচ দিয়ে বৌ আনবি? নেই নেই করেও একটা বে'র খরচ কি কম? কেন, চার-চারটে পাস করেছিস তুই, একেবাবে যে অক্ষ্যাম তাও নোস, দুহাজার টাকাও দেবার মতো মেয়ে মিলবে না দেশে? নাকি সোন্দর মেয়েও আর নেই কোথাও।'
'এত হিসেব আর কারণকম্মি যখন করেছি, এই খরচগুলো ধরেই কবেছি মা।' ঈষৎ ক্লান্ত কণ্ঠেই বলে প্রবীর, 'যে দু হাজার টাকা নিয়ে আসবে সে চার হাজার টাকার মেজাজ আনবে সঙ্গে। আমি টাকা খরচ কবে যাকে আনব সে মাথা হেঁট করে আসবে, এখানে এসে যা পাবে তাতেই বর্তে যাবে—আমাদের অভাবের সংসারে এসে নাক সিঁটকোবে না। তুমি ভাবছ সুন্দর মেয়ে দেখে এতগুলো টাকা খরচ করছি, সেটা তোমার ভুল। কালো-কুচ্ছিত মেয়ে হলেও আমি গরীবের

ঘর থেকেই আনতুম, এক পয়সা না নিয়েই। অবস্থাপন্ন ঘরের হাজার সুন্দর মেয়ে হলেও বিয়ে করতুম না—তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

এ হিসেবটা মায়ের মাথায় ঢোকে না।

মা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে।

মাথাটা ঠিক আছে কিনা ভাবার চেষ্টা করেন।

প্রবীরের কোন হিসেবই তিনি ভাল বুঝতে পারেন না।

সবেতেই উল্‌টো বোঝে চিরকাল, নইলে এতগুলো পাস করে কেউ ছেলে ঠেঙাতে যায়?

ওর চেয়ে ঢেরকম লেখাপড়া শিখেও বড়ছেলে তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটছে!

তিনি বিরস বদনে বলেন, 'গরীবের ঘরের মেয়ে হলেই যে চিরদিন তোমার কাছে হাতজোড় করে থাকবে তার কোন মানে নেই বাবা, ও আমি ঢের দেখেছি। বরং তারাই আদেখ্‌লে হয় আরও, আ-ধনিকের ধন হলে দিনে দেখে তারা! এ মনে মনে ভেবে আসছে সোন্দর বলেই আমরা এত এরেবেরে এক-কাঁড়ি টাকা খরচ করে আনছি! যার যা বরাতে আছে তা হবেই, বিয়েতে এত হিসেব খাটে না, কথায় বলে ভবিতব্যি!'

তাঁর মুখের কথাটাই ছেলে যেন লুফে নেয়।

বলে, 'তাই যদি মানো তো আর অত চিন্তা কি। এই আমার ভবিতব্য ধরে নিলেই হয়। আমার বরাতে এই ছিল। যদি এও এসে দিনে তারা দেখতেই শুরু করে তো সেও আমার বরাত বুঝতে হবে।'

এর ঠিক ভালোমতো উত্তর আর দিতে পারেন না শৈবলিনী, চুপ করে যান। মুখে যাই বলুক, মাকে যেমন করেই চুপ করিয়ে দিক, এ আশঙ্কা প্রবীরেরও ছিল বৈকি।

মনের অগোচর পাপও যেমন নেই, তেমনি চিন্তাও না।

রূপটা যে কিছুটা আকর্ষণ করেনি তাও তো নয়।

সেই জন্যেই সুনেত্রার উচ্ছ্বাসে, অদৃষ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এত তৃপ্তি বোধ করে।

আর সেই কারণেই, দিন আষ্টেক কাটবার পর যখন সুনেত্রা মাকেই বলে, 'রাত্রের জন্যে মাছ আনতে বারণ করে দিন মা, কী দরকার মিছি-মিছি, এই জন্যে আবার আপনাকে রাত্রে রান্না করে দিয়ে কাপড় ছাড়তে হয়, গা ধুতে হয়। যখন আমাকে এখন রান্না করতে দেবেনই না—তখন আর এত কাণ্ডর দরকার নেই। এই তাই রোজ এখানে মাছ খাই শুনে আমার বোনেরা বিশ্বাস করতেই চায় না, বলে—ওরা অত বড়লোক তো তোকে নিয়ে গেল কেন?···আমাদের ওখানে মাসে দুদিনের বেশী মাছের কথা ভাবতেও পারতুম না। রাত্রে তরকারিই হয় না কোন দিন, ডাল আর রুটি—এই আমাদের বাস্তুদেবতা।' তখন মার দিকে চেয়ে একটু বিজয়-গর্ব প্রকাশের লোভও সামলাতে পারে না।

অবশ্য শুধু সুন্দর মেয়ে দেখেই প্রবীর ভুলে গেছে, টাকার কথা চিন্তা করে নি—এটাও কিন্তু ঠিক নয়।

মেয়ে দেখার আগেই সে ওঁদের কথা দিয়েছে যে সে যদি বিয়ে করে তো এক পয়সা না নিয়েই করবে এবং বিয়েটা তার নিজের অবস্থানুযায়ীই হবে।

এ সম্বন্ধে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের জীবন থেকে বহু কটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে।

যেখানে হয়ত চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয় বরপক্ষের—মেয়ে দেড় হাজার কি দুহাজার টাকা এনেই বিস্তর খোঁটা দেয়। ভাবে সেই টাকাতেই বিয়েটা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

সুনেত্রা সুশ্রী এটা সে শুনেছিল—কিন্তু বিবাহযোগ্যা মেয়ে মাত্রকেই যেখানে সুশ্রী এমন কি সুন্দরী বলেই বিজ্ঞাপিত করা হয়—সেখানে সে কথাটার ওপর এমন কোন গুরুত্ব দেয় নি।

মেয়ে পছন্দ করেছে সে অন্য কারণে।

হতদরিদ্র বলেই।

হতদরিদ্র, অনাথ এবং অসহায়।

সুনেত্রার মা বাবা কেউ নেই।

ওর জন্মের অল্পদিন পরেই ওর মা মারা যান।

মার মৃত্যুর পরই বাবা একটি বিয়ে করেন।

সেই এক বছর বয়স থেকেই পরের ঘরে, পরের দয়ায় বেঁচে আছে। প্রথমে দিদিমার কাছে, পরে দিদিমা মারা গেলে—আর কেউ না থাকাতেই—মাসীর কাছে এসে পড়তে হয়েছিল।

দ্বিতীয় বার বিয়ের পর ওর বাবাও বেশীদিন বাঁচেন নি।

সেই সঙ্গে ওদিকে যে ক্ষীণতম ভবিষ্যতের আশাটুকু—আশ্রয়ের সম্ভাবনা ছিল—তাও ঘুচে গেল।

পিতৃকুলে এমন কেউ নেই যে খোঁজখবর করে বা এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করে।

নিজের বাড়ি ছিল না ভদ্রলোকের, একখানা ঘরে ভাড়া থাকতেন। অন্য কারও কাছে গিয়ে উঠবে সে উপায়ও ছিল না।

কোন কাকা কি জ্যাঠা এমন কি কোন জ্ঞাতির খবর পর্যন্ত জানা নেই কারও।

ওর সৎমা বেঁচে আছেন, তিনিও নাকি কার বাড়ি রান্নার কাজ করে জীবন ধারণ করেন।

তাঁরও কেউ নেই নাকি। ছিলও না। নইলে অমন পাত্রেই বা বিয়ে হবে কেন?

সেই জন্যে সুনেত্রার মেসো মনোরঞ্জনবাবু ওকে পুষেছিলেন—বাধ্য

হয়েই।

রূপকথার সেই দৈত্যের গল্পের মতো—নৌকোর দাঁড় আর কারও হাতে তুলে দিতে পারেন নি বলেই।

তিন বছরের মেয়েকে সত্যিই কিন্তু পথে ফেলে দিতে পারেন না।

কোন অনাথ আশ্রমে দিতেও চক্ষুলজ্জায় বেধেছিল।

বিশেষ শাশুড়ি মরবার সময় হাতে ধরে বলে গিয়েছিলেন, 'একটু ঠাঁই দিও বাবা মেয়েটাকে—তোমার কাছে মরণকালে আমি এটা ভিক্ষে চাইছি। দোহাই বাবা। রাক্ষুসী মেয়ের কোন কুলে এমন কেউ নেই যে তার কাছে পাঠাতে পারি।'

আরও বলেছিলেন, 'আমিই যদি আর কিছুদিন বাঁচতুম—তোমার ঘাড়েই তো একে পড়তে হ'ত—তুমি কি ফেলতে পারতে? তাই ভেবেই দুটো খেতে পরতে দিও। বিয়ে? সে তখন হয় হবে—না হয় না হবে।'

আরও মুশকিল—সুরূপা মেয়ে, যার তার কাছে দেওয়া যায় না।

এ মেয়েকে বয়স কালে কুপথে নিয়ে যাবার লোকের অভাব হবে না—এটুকু বেশ বুঝেছিলেন মনোরঞ্জনবাবু।

সে বয়স হবার আগেও ওকে হস্তান্তর করতে চাইলে বহু লোক এগিয়ে আসবে।

এরকম ব্যবসা যে হয় তা অনেকের মুখেই শুনেছেন।

অথচ মনোরঞ্জনবাবুর এই অতিরিক্ত পোষ্য পালনের অবস্থা নয়।

তিনিও ইস্কুল মাস্টার, প্রবীরের মতো এম. এ. পাস শিক্ষক নন, আই. এ. পাস বি. এ. ফেল মাস্টার, সেকালে কাকে ধরে ঢুকে গিয়েছিলেন তাই চাকরি যায় না—তবে এতদিনেও কোন উন্নতি হয় নি, স্বল্প বেতনের নিচের ক্লাসের শিক্ষকই রয়ে গেছেন।

আর সেই কারণেই, টিউশ্যনীতেও ভাল পারিশ্রমিক পান না।

ওঁকে যারা গৃহ শিক্ষক রাখে তারা যেন কতকটা অনুগ্রহই করে, তাছাড়া

তাদেরও অবস্থা ভাল নয়, নইলে ওঁর মতো নন্‌গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক রাখবে কেন—যেখানে গ্র্যাজুয়েটের এত ছড়াছড়ি।

পরীক্ষার খাতা দেখা কি পাঠ্য-পুস্তক লেখা প্রভৃতি প্রবীরদের যে বাড়তি আয়ের পথ আছে,—মনোরঞ্জনবাবুর তাও নেই।

ফলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও—পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চালানোই সমস্যা রয়ে গেল চিরদিন।

তাও কি ভালো ভাবে খেতে দিতে পারেন? কোনমতে জীবনটা বাঁচিয়ে রাখা—এইতেই ওঁর জীবনান্ত হয়ে যায় বলতে গেলে।

আয় যে অনুপাতে কম—ব্যয় সেই অনুপাতেই বেশী।

সংসার ওঁর আয়ের তুলনায় বড়ই।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বৃদ্ধ বাবা ছিলেন।

তিনি সম্প্রতি মরে রেহাই দিয়েছেন—কিন্তু তা ছাড়াও, তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলে, স্বামী স্ত্রী তো আছেনই এবং বোঝার ওপর শাকের আঁটি, সুনেত্রা।

শিক্ষক বলেই পাড়ার একে-ওকে ধরে ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বইও যোগাড় হয়ে যেত—নমুনা বই সংগ্রহ করে।

তবু, এ ছাড়াও কিছু কিছু খরচ আছে।

খাতা পেন্সিল মানের বই—এখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা রকম বায়-নাক্কা—এসব চেয়ে চিন্তে হয় না।

তাছাড়াও—ছেলেমেয়েরা যখন বড় হল তাদের পেট বাড়ল, পোশাকের মাপ বাড়ল; মেয়েদের শাড়ির প্রয়োজন হল—আনুষঙ্গিক হিসেবে সায়া ব্লাউজ বডিজ—তখন দড়ির দুপ্রান্ত মেলানো কঠিন হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত মেলানো গেলও না।

সুনেত্রা ও তাঁর বড় মেয়ে গোপার একই সঙ্গে পাস দেবার কথা কিন্তু ফীয়ের তত টাকা যোগাড় করা গেল না কিছুতেই।

মাসীর গায়েও এমন সোনা আর অবশিষ্ট ছিল না—যা বেচা কি বাঁধা দেওয়া যায়।

অন্য কিছু তো ছিলই না। ভারী পেতল কাঁসার বাসন—যা বিক্রী করা যায়—তা অন্তর্হিত হয়েছে অনেক দিনই।

মনোরঞ্জনবাবুরও ধার করার পথ বিশেষ খোলা ছিল না কোথাও। সুতরাং তিনি স্পষ্টই বলতে বাধ্য হলেন সুনেত্রাকে, 'মা, তোমার তবু ফরসা রঙ আছে, মুখশ্রীও ভাল—তুমি একরকম করে হয়ত পার হয়ে যাবে—কিন্তু আমার খুকী একে কালো, তায় আমার মতো থ্যাবড়া মুখ—ওর বিয়ের কোন আশাই নেই, ওকে পাস না করালে ওর কোন গতি হবে না। তাই ওর টাকাটাই জমা দিচ্ছি, তোমার পরীক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আর করতে পারলুম না এবছর। তুমি দুঃখিত হয়ো না—আমার কথাটা বুঝে দেখো। চর্চাটা ছেড়ো না—যদি পারি আসছে বছর চেষ্টা করব।'

৩

বলা বাহুল্য, সে আসছে বছরটা আরও অনেক বছরেও আসে নি আর।
গোপার পর সোমা, তারপর মোহন, তারপর চন্দ্রা—পর পরই ছিল।
তারা নিজের সন্তান, তাদের দাবী বেশী।
সে দাবীতে জোর দেওয়ার জন্যে তাদের মা আছেন।
এরা একে একে পালা করে কলেজ ঢুকল, তবু তো সোমাকে কলেজে দিতে পারলেন না—মোহন এক বছর ফেল করে বসল ; সে ছেলে, তাকে লেখাপড়া শেখাতেই হবে, সুতরাং কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা, আরও এক বছর পরীক্ষা বাবদ একগাদা টাকা জমা দেওয়া, এতেই চোখে অন্ধকার দেখলেন মনোরঞ্জনবাবু।
সুনেত্রার পরীক্ষা দেওয়ার কোন প্রসঙ্গই উঠল না আর।
অবশ্য সুনেত্রারও যে তেমন কোন আগ্রহ ছিল তা মনে হয় না—প্রবীরের অন্ততঃ তাই ধারণা।
সে ইস্কুলে পড়ায়, এমন ছাত্র অনেক দেখেছে—যাদের পরীক্ষা দেওয়া কি আরও পড়ার আগ্রহকে কিছুতেই দমিয়ে রাখা যায় না।
তেমন হলে মনোরঞ্জনবাবুও চেষ্টা করতে বাধ্য হতেন।
সুনেত্রা সহজেই গা এলিয়ে মাসীর সাংসারিক কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মাসীও বাধা দিলেন না, বরং বেঁচে গেলেন।
তাঁর নিজের মেয়েরা ওদিক দিয়ে যায় না ; আর তিনিই বা কত পেরে ওঠেন।
এতগুলি লোকের রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করা কম পরিশ্রমের ব্যাপার

তো নয়।

তবু পরীক্ষা না হোক, বিবাহের জন্য একটু চিন্তিত হতেই হয়।

নিজের মেয়েরা তো আছেই, কিন্তু একে পার না করলে ওদের প্রশ্নই ওঠে না। ভেবে ভেবে ক্রমশ উদ্বেগ বেড়ে যায়।

স্কুল মাষ্টারের অসহায় অদৃষ্টবাদ ত্যাগ করে কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

মনোরঞ্জনবাবুর এক বাল্যবন্ধু প্রবীরদের সহকর্মী—হৃদয়বাবু।

নির্বিরোধী ও শিক্ষানুরাগী বলে প্রবীর তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

তাঁর সুবাদেই প্রবীরের সঙ্গে মনোরঞ্জনের আলাপ।

প্রবীর ব্রাহ্মণ, ওঁদের পাল্‌টি ঘর—জানার পর থেকেই কথাটা মনোরঞ্জন বাবুর মাথায় গেছে।

দিন কয়েক উশখুশ করারপর একদিন তিনি সোজাসুজি চেপে ধরলেন প্রবীরকে।

সুনেত্রার অসহায় অবস্থাটা আগেই জানিয়েছিলেন হৃদয়বাবুকে দিয়ে—প্রবীর যদি দয়া না করে, অনাথা মেয়েটার আর জীবনে কোন কূল পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

তাঁর যা আয় প্রবীরের তা না জানবার কথা নয়—কতটা পর্যন্ত মাইনে তিনি পেতে পারেন শহরতলির ঐ বেসরকারী ইস্কুলে, তা যে-কোন ইস্কুল মাস্টারই আন্দাজ করতে পারবেন।

সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত, চাকরি ছাড়াও তিনটে টিউশ্যনী করেন, তাতে পান মোট আশিটি টাকা, ছেলে বড়মেয়ে দুজনেই পাড়াতে টিউশ্যনী করে একটা করে বটে তবে সে টাকা তাদের নিজেদের পড়ার খরচেই চলে যায়—মনোরঞ্জনবাবুর এক পয়সাও সাশ্রয় হয় না তা থেকে, উল্‌টে যে সময়টা তারা বাজার রেশনগুলো ধরলে উনি আর একটা টিউশ্যনী ধরতে পারেন, সেটাও হয়ে ওঠে না—সাংসারিক ঐসব কাজে সময় চলে যায় বলে।

এ অবস্থায় চারটি মেয়েকে পার করা তাঁর সাধ্য নয়।

সে কোন দিনই সম্ভব হবে না তা তিনি জানেন। সুতরাং একটিকেও যদি পার করতে হয়তো আগে, যেটি নিজের মেয়ে নয়—তার কথাটাই সর্বাগ্রে চিন্তা করা উচিত।

এইখানে মনোরঞ্জনবাবু একটু মহত্ত্বগৌরব নেওয়ার লোভ সামলাতে পারলেন না—নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে পারুন বা না পারুন, তাতে কেউ তাঁকে দুষবেও না, এই যে একটা পরের অনাথা নির্বান্ধব মেয়ের ভার তিনি নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, তার কোন ব্যবস্থা না করে যেতে পারলে বিবেকের কাছে দায়ী থাকবেন তিনি চিরকাল।

তাছাড়াও কথা আছে।

তাঁর নিজের মেয়েদের তবু একটা করে পাস করিয়ে দিয়েছেন, বিয়ে না হোক, পাঠশালার মতো করে ছেলেমেয়ে পড়িয়েও তারা দুটো খেতে পাবে—এ মেয়েটাকে একটা পাসও করাতে পারেন নি—সে জন্যে আরও চিন্তা তাঁর, এর দায়িত্ব আরও বেশী।

তবে—এ কথাও উনি বলে দিয়েছিলেন সেই সঙ্গেই, মেয়ে সুশ্রী বটে, সকলেই তা মানবে, নিজেদের মেয়ে না হলে সুন্দরীই বলতেন—পয়সা একটিও খরচ করতে পারবেন না।

এমন কি মেয়েকেও কিছু দিতে পারবেন না।

তাঁর সারা বাড়ি ঝাঁট দিলেও একভরি সোনা বেরোবে না—কোত্থেকে দেবেন তিনি?

যা খরচ করতে হবে—চেয়ে-চিন্তে, একরকম ভিক্ষা করেই।

প্রবীর রাজী হোক বা না হোক—একথাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

প্রবীর প্রথম কোন আপত্তি তোলে নি, অযথা লজ্জিতও হয় নি—তেমনি আনন্দেও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি।

ধীরভাবে বসে সব শুনেছিল, শোনার পর চুপ করে বসে ভেবেছিল কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিল, 'আমি আদৌ বিয়ে করব কিনা এখন, অর্থাৎ করা সম্ভব কিনা—সেটাই আগে ভেবে দেখি একটু। তবে এইটুকু

আপনাকে বলতে পারি—বিয়ে যদি করি আপনার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করব না, নিজে যদি সব খরচ দিয়ে বিয়ে করতে পারি তবেই করব।'

এইটুকুই যথেষ্ট।

এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকুই অসামান্য ফাঁদ হয়ে দাঁড়াল।

কথাটা কি করে ইস্কুলের শিক্ষক মহলে প্রচার হয়ে গেল—হৃদয়বাবুই সম্ভবত করে থাকবেন—পরের ওপর দিয়ে একটা উদারতা ও মহত্ত্বর দৃষ্টান্ত স্থাপনের এমন সুযোগ পেয়ে সকলেই উঠে পড়ে লাগলেন।

পরোপকারটা যদি বিনা খরচে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে করা যায় তো অনেকেই তাতে এগিয়ে আসেন।

এঁরা তো আসবেনই।

ইস্কুল মাস্টারের পূর্ব ঐতিহ্য না থাক, আদর্শবাদের ছায়াটা বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণ যায়নি।

সকলে মিলে অহরহ প্রবীরকে বোঝাতে লাগলেন যে, এই একটা দরিদ্র অথচ মহাপ্রাণ মানুষ, যে স্বেচ্ছায় পরের এতবড় ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিয়েছিল এবং এখনও নিজের তিনটি মেয়ে থাকা সত্ত্বেও, যে সেই পরের মেয়েটির বিয়ে দেবার জন্যে এতটা কষ্ট এতটা দীনতা স্বীকার করছে—তাকে এ দায় থেকে উদ্ধার করা প্রবীরের মতো উচ্চশিক্ষিত ছেলের অবশ্য কর্তব্য।

কর্তব্য তার দুদিকেই।—ওঁরা আরও বোঝালেন।

বরং এদিকটা অনেক বেশী।

মা বৃদ্ধ হচ্ছেন—তাঁর সাংসারিক কাজে সাহায্য করার একটা লোকও তো চাই এবার।

আর তার এত চিন্তারই বা কি আছে? গরিবের মেয়েই ঘরে আনছে,

রাজরানী তো কেউ আসছে না।

একটা ঝি রাখার যা খরচ তার চেয়ে বেশী হবে না নিশ্চয়ই।

অথচ সাধারণ ঝিয়ের থেকে বেশী কাজ পাওয়া যাবে তাকে দিয়ে।

প্রবীরের শূন্য শ্রান্ত জীবনে একটা সঙ্গিনীর কথাও চিন্তা করার সময় আসে নি কি ?···

এদিকে ওকে বোঝাতে লাগলেন, আর অন্যদিকে প্রচার করে দিলেন —প্রবীর আজকালকার ছেলেদের মধ্যে আদর্শ, দৃষ্টান্তস্থল ; সে এক-পয়সাও না নিয়ে, বরং সেখানকার সব খরচ দিয়ে দরিদ্রের কন্যাদায় উদ্ধার করতে রাজী হয়েছে।

এইটাই তাঁদের মারাত্মক অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

দলে দলে পরিচিত লোক যখন ওর এই মহানুভবতা ও ঔদার্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে শুরু করল তখন প্রবীর না পারল তার প্রতিবাদ করতে, না পারল স্বীকার করে নিতে।

প্রথম প্রথম দু একজনের ভুল ভাঙার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জনে জনে তো আর বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

শেষ অবধি কতকটা ক্লান্ত হয়েই চুপ করে গেল।

আর, তার ফলে এই মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে আরও সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, সাধুবাদ দিতে লাগলেন।

অগত্যা একরকম বাধ্য হয়েই রাজী হতে হল প্রবীরকে।

তবু সে একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিল।

মনোরঞ্জনবাবুকে বুঝিয়ে বলতে গিয়েছিল, 'দেখুন, এই তো অবস্থায় থাকি, আপনি একবার বরং গিয়ে দেখুন ঘর দোর, মাটকোঠা না হলেও সেই রকম অবস্থা, টিনের চালা, দেড়খানা ঘর। এখন চট করে এ ব্যবস্থা পাল্‌টানোও সম্ভব নয়, বিয়ে হলে হয়ত আরও জড়িয়ে পড়ব,

তখন তো একেবারেই সম্ভব থাকবে না। একটা খাট কেনারও সঙ্গতি নেই—কিনলেও ঐ ঘরে ধরাতে পারব না। এরকম ঘরে আপনাদের মেয়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।'

প্রবীর বলতে গিয়েছিল তার পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের জীবনযাত্রার মান স্মরণ করেই।

কিন্তু সত্যিই—কথাটার মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না। অন্তত এক্ষেত্রে, মনোরঞ্জনবাবুদের অবস্থার তুলনায়।

মনোরঞ্জনবাবু ওর সেই বহুক্ষণ ধরে ভেবে চিন্তে, মনে-মনে-রিহার্স্যাল-দেওয়া কথাগুলো এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন, 'রাজা রাজা! আমি যে অবস্থায় থাকি তা তো তুমি দেখো নি—ভিখিরীর অধম। আমাদের তুলনায় তুমি তো ভায়া রাজা! বেবির ভাগ্য ভাল, শিব পুজো সার্থক ভাবব—যদি তোমার গলায় মালা দিতে পারে।'

এরপর আর কিছুই বলার থাকে না।

অন্তত প্রবীর বলতে পারে না।

বরং এই পিছিয়ে আসার চেষ্টাটাকেই এগিয়ে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি ধরে নিয়ে মনোরঞ্জনবাবু তৎক্ষণাৎ প্রচার করে দেন কথাটা যে, প্রবীর দয়া করে তাঁর কন্যাদায় বা শালীঝি-দায় উদ্ধার করতে সম্মত হয়েছে। এখন সবাই মিলে দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা সুসম্পন্ন করিয়ে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

এবং বহুদিন পরে একটা আশার আলো দেখতে পেয়ে অসম্ভব রকমের কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার মধ্যে হেড পণ্ডিতকে দিয়ে দিন দেখিয়ে তারিখটা জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

'শুভস্য শীঘ্রম' বুঝে পণ্ডিত মশাইও যতটা সম্ভব দ্রুত কাজ করার ব্যবস্থা করলেন।

প্রবীরও অবশ্য আর পিছিয়ে আসার চেষ্টা করে নি।

বিবাহে যেমন খুব ইচ্ছা ছিল না তার, তেমনি অনিচ্ছাও ছিল না।
ইদানীং একটি সঙ্গিনীর কথা মনেও হচ্ছিল কিছু দিন ধরে।
মা-বেটার সংসারে একটি তরুণ উপস্থিতি।
এ ইচ্ছাটা বোধহয় কারুর মন থেকে কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত হয় না।
এই একটি মধুর স্বপ্ন-কল্পনা।
বহুবার রূঢ় বাস্তবের আঘাতে এই স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে দেখেও না।
সে কল্পনার সঙ্গে সে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব মেলে লাখে একটা। তা জেনেও মানুষ বিরত হয় না।
অতি সূক্ষ্ম বীজাকারে মনের কোন মাটির ঢেলার তলায় পড়ে থাকে—সামান্য একটু প্রশ্রয়ের আবহাওয়া পেলেই তা অঙ্কুরিত হয়।
নিজেকেই নিজে আশ্বাস দেয়—অন্যের বেলা সে কল্পনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও তার বেলা যাবে না।
এই আশ্বাসের অনুকূল যুক্তিই সে খুঁজে বেড়ায়।
প্রবীরও মানুষ।
সে নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে কর্তব্যর অবলম্বনটাও আঁকড়ে ধরল।
নিজেকে বোঝাল, মার শরীর যে রকম ভেঙে আসছে—বিশেষ করে মন—তাতে তাঁকেও সাহায্য করার লোক সত্যিই একটি দরকার।
তার চেয়েও বেশী দরকার জীবনে তাঁর উৎসাহ ও আসক্তি ফিরিয়ে আনা।
সেজন্যে একটি ভরা সুখের সংসার, নাতি-নাতনী চাই।
আর বিয়ে যদি করতেই হয়—এ মেয়েই বা মন্দ কি ?
যা চেয়েছিল এ তো তাই, গরিবের ঘরের মেয়ে।
শূন্য-হাতে মাথা নিচু করে আসছে, উপরন্তু উপরি পাওনা—সুশ্রী চেহারা।
সবাই বলছে সুন্দরী, সুন্দরী যদি নাও হয়—কিছুটা ভালো দেখতে তো বটেই।

এ ছেলের সবই অদ্ভুত, কিন্তু তাই বলে এমন কাণ্ড করবে তা এর আগে কখনও ভাবেন নি শৈবলিনী।

ভাবা যায়ও না। কেউই ভাবতে পারে না।

দীন ভিখিরীও না।

মাত্র ছটি বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে গেল সে, নাপিত-পুরুত সমেত।

ঠিক কজন গেলে মনোরঞ্জনবাবুদের অসুবিধা হবে না, ব্যস্ত হতে হবে না, পরের বৈঠকখানা ধার করতে হবে না এবং বিনা হালুইকরেই রান্নার ব্যবস্থা হতে পারবে, তা আগেই জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল প্রবীর।

স্ত্রী বলেছিলেন পনেরো, হৃদয়বাবু বলেছিলেন, 'না না, সবদিকে টানা-টানি করো না, কুড়ি জনই বলো।'

মনোরঞ্জনবাবু অনেক ভেবেচিন্তে ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন—দশজন।

ভয়ে ভয়ে এই জন্যে যে, এত কমে নিশ্চয়ই হবে না—প্রবীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ইস্কুলের ক'জন সহকর্মীকে তো নিশ্চয়ই বলবে,—সেই সংখ্যাটা কমিয়ে আনার জন্যেই যথেষ্ট নিচে থেকে ধরেছিলেন তিনি, দশ জন শুনলে লাফিয়ে উঠবে, প্রবল প্রতিবাদ করবে—অন্তত চিন্তিত হয়ে পড়বে—তখন উনি আর একটু উঠবেন।

আগে থাকতে কুড়ি বললে প্রবীর হয়ত চল্লিশ বলে বসবে।

প্রবীর কিন্তু সেরকম আপত্তি বা প্রতিবাদের দিক দিয়েই গেল না, প্রশান্ত মুখেই বললে, 'অতও হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর মনোরঞ্জনবাবুর বিস্ময় লক্ষ্য করে বলেছিল, 'আমার আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়াতে হয় আমিই খাওয়াবো, আপনার ওপর জুলুম করব কেন?'

বৌভাতেও সে ফর্দ ধরল, মোট ষাট জনের মতো। শৈবলিনী অবাক্ হয়ে বললেন, 'সে কি রে, এই শহরে আমার নিকট-আত্মীয়ই তো কত—'

প্রবীর হাসল একটু।

'তারা সুসময়ের আত্মীয় মা। আবার যদি কোন দিন আমাদের সুদিন আসে, সেই দিন তাদের ডেকো। এখন এই অবস্থায় তাদের ডেকে এনে, কীভাবে আছি, কীভাবে বিয়ে করলুম—তা দেখানো কি তোমারই ভাল লাগবে? তুমিই লজ্জিত বোধ করবে, দুঃখ পাবে। কী দরকার! তোমার এই নিকট-আত্মীয়রা কে কত তোমার খবর নিতে আসছে?'

বেছে বেছেই নিমন্ত্রিতর ফর্দ ধরেছে সে।

স্কুলের কটি শিক্ষক, প্রাইভেট ছাত্রর অভিভাবক দু তিন জন, দু একটি প্রকাশক ও এই পাড়ায় দুপাশের বাড়ির দুজন—এর বেশি কাউকে সে বলে নি।

মামাদের পর্যন্ত না।

শৈবলিনী বললেন, 'তা হ্যাঁরে, তোর সোনা-কাকারা রয়েছেন, বড় মামা—এদের না বললে বরকর্তা কে দাঁড়াবে? নতুন কুটুমরাই বা কি মনে করবেন!—আর হ্যাঁ রে, বড়খোকা বৌমা ওদের একটা চিঠি তো অন্তত দিবি!'

প্রবীরের প্রশান্ত মুখে এবার ভ্রূকুটি দেখা দেয়।

একটু অসহিষ্ণুই হয়ে ওঠে যেন।

'নিশ্চয়ই দেব না। কী করতে দেব মা, গাল বাড়িয়ে চড় খেতে? বড় জোর বৌদি একটা চিঠি দেবেন—কোন্ বিশেষ কারণে আসতে পারলেন না তাই জানিয়ে, হয়ত কৈফিয়ত দেবেন মেয়ের পরীক্ষা কিংবা ছেলের বন্ধুর জন্মদিন—বড়জোর মনিঅর্ডারে হয়ত দশকুড়িটা টাকা পাঠাবেন। কী দরকার মা, যারা শান্তিতে থাকবে বলে তোমাকে ত্যাগ করে গেছে তাদের বিরক্ত করার। এবার পূজোতে একখানা চিঠি পর্যন্ত কেউ লেখে নি, সে কথাও কি ভুলে গেলে?'

'কিন্তু এরা, তোর মামারা কি অপরাধ করলে বল?'

'ছি ছি, তাঁরা কেন অপরাধ করবেন! অপরাধী আমরা—আমাদের

অবস্থা খারাপ, সময়ে ভাল একটা চাকরির চেষ্টা দেখ নি ! এইটেই যথেষ্ট অপরাধ···আর, মিছিমিছি, বলা মানেই তাঁদের একগাদা খরচে ফেলা। তারপর, তাঁরা এসে এটা ওটা উপদেশ দেবেন—সে সব হয়ত শুনতে পারব না—তাঁরাও অপমানিত বোধ করবেন। আমি আমার মতো-বিয়ে করছি, দীন-দরিদ্রের বিয়ে—তার মধ্যে ওসব ভদ্রলোকদের টেনে এনে লাভ নেই। আর বরকর্তা ? সে যে কেউ নেই, তা তো কন্যাপক্ষ জানেনই, তাঁরা তো আমার সঙ্গেই কথা কয়েছেন, অভিভাবক কারও তো খোঁজ করেন নি। বরকর্তা না দেখলে তাঁরা খুশীই হবেন বরং। বর-কর্তা এলেই নানা প্রশ্ন করবেন, দেখতে চাইবেন কন্যাপক্ষ কী দিলেন, কতটা ফাঁকি দিচ্ছেন ! না মা, ওতে দরকার নেই।'

মা ব্যাকুল ভাবে আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রবীর সে সুযোগ না দিয়ে ব্যস্তভাবে নিজের কাজে চলে গেল।

মা নীরবে নিজের ললাটে করাঘাত করলেন।

প্রবীর ধরে নিয়েছিল ওঁরা কিছুই দেবেন না। মনোরঞ্জনবাবুরা।

সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়েছিল সে।

গায়েহলুদের তত্ত্বে কোন প্রসাধন সামগ্রী কি বাসন ইত্যাদি পাঠায় নি —তেলহলুদ, ফুল, চন্দন, মাছ ওমাত্র একথালা মিষ্টি—কিন্তু শাড়িখানা দিয়েছিল মূল্যবান দেখেই।

সে সঙ্গে—এ তত্ত্বের সঙ্গে একান্ত বেমানান—এক জোড়া সোনার বালা। মনোরঞ্জনবাবুদের পাত্রী সভাস্থ করার কোন অসুবিধা না হয়—সেই হিসাব করেই দিয়েছিল সে এদুটো।

হয়ত তাছাড়াও, তার ভাবী বধূকে একেবারে নিরাভরণ অবস্থায় দেখতে তার মন চায় নি।

কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু একেবারে শুধু-হাতে পার করেন নি।

তিনিও একখানি ভাল শাড়ি ও তিনগাছা করে সোনা-বাঁধানো ব্রোঞ্জের চুড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন।

আত্মীয়রা কেউ কেউ এবং সহকর্মী শিক্ষকরাই নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী চাঁদা তুলে এই টাকাটা যোগাড় করে দিয়েছিলেন—সুতরাং এ ছাড়াও একপ্রস্থ দানের বাসন, জামাইয়ের ধুতি-চাদর ও আংটি, ফুলশয্যার একখানি শাড়ি ও ধুতির আয়োজন ছিল তাঁর।

ফলে বিয়েটা স্বাভাবিক সাধারণ বিয়ের মতোই মনে হয়েছিল কতকটা।

এ বাড়িতে আসার পর প্রবীরের মা তাঁর নিজের হার এবং ক'গাছি সোনার চুড়ি দিয়ে মুখ দেখেছিলেন বৌয়ের।

এও সুনেত্রার কাছে অভাবনীয়।

এত গয়না কোনদিন গায়ে উঠবে, স্বপ্নেও কি ভেবেছিল?

বহুদিন পর্যন্ত সে নির্জনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিল ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিল এই অচিন্তিত সৌভাগ্য।

প্রবীরও তার পূর্ব পরিকল্পনা ঠিক রাখতে পারে নি—কন্যাপক্ষের ক'জন নিয়ে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা আশির কিছু ওপরেই পৌঁছেছিল।

মার চোখের জল দেখে শেষ পর্যন্ত মামার বাড়ি ও বাবার পিসতুতো ভাই—ওদের সোনাকাকাকেও বলতে হয়েছিল।

সেই-মতো একটু ম্যারাপ, অভ্যাগতদের বসার জন্যে পাশের বাড়ির বৈঠকখানা (সেজন্যে তাদের বাড়ির সকলকেই বলতে হয়েছে), এবং হালুইকর বামুনেরও ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সুনেত্রার মতে এটা রীতিমতো জাঁকের বিয়ে—তার পক্ষে এটা অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের কথা।

যে এতদিনের জীবনে কোনদিন বিয়ের স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে সাহস করে নি—আশা করা তো দূরের কথা—তারপক্ষে এ যেন রূপকথার মতোই অবাস্তব।

৪

সেই জন্যেই প্রবীরের মনে হয়েছিল তাদের যে দাম্পত্য-জীবন-তরণী সৌভাগ্যের বাতাসে পাল তুলে সুখের স্রোতেই যাত্রা শুরু করছে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ঘাটেই তা ভেড়াতে পারবে।

এতদিন রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটা মনে পড়লেই একটা অকারণ চিত্ত-দাহের সৃষ্টি করত—সেই 'বহুদিন মনে ছিল আশা' এখন প্রায়ই মনে মনে আবৃত্তি করে আর ভাবে তার দুঃখের দিন এবার শেষ হ'ল।

সত্যিই সুখে ছিল ওরা।

এত স্বল্প উপাদানে এত সুখী কেউ হতে পারে তা কখনও কল্পনাই করে নি প্রবীর।

এ রকম অভিজ্ঞতার অবসরও তো মেলে নি এতদিন।

দাদার দাম্পত্য জীবন যে খুব সুখের এমন সন্দেহ কখনও হয় নি তার। তাদের সেই জীবন দেখে অন্তত বিয়ে করার কোন আগ্রহ জাগে নি কখনও।

বিশেষ যখন ফুটফুটে ফুলের মতো সুন্দর একটি ছেলে হল তখন তো মনে হয়েছিল—ওদের সুখসৌভাগ্যের পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠল এবার।

ওর মার মুখেও হাসি ফুটল।

এতদিন পরে আবার তিনি যেন সংসারে নতুন আগ্রহের কারণ খুঁজে পেলেন।

কিন্তু সব মেঘেই যেমন একটি করে স্বর্ণরেখা থাকে, তেমনি সব

সোনালীস্বপ্নেই একটি মেঘের আভাস থাকবে বৈকি।

অসন্তোষ ও অতৃপ্তির কোন কারণ না থাকলেও মানুষের মন একটা কারণ খুঁজে বার করে ঠিক।

অশান্তিও বোধ করি তার জীবনে প্রয়োজন, ভোজ্যের মধ্যে তিক্ত ও অম্লরসের মতো।

এটাই একটা বড় বৈচিত্র্য।

সুনেত্রার মনেও এমনি একটা অসন্তোষ দেখা দিল ধীরে ধীরে।

অকারণ, প্রায় আকাশ-থেকে-খুঁজে আনা অসন্তোষ, অতৃপ্তি।

আগেও প্রবীর দিন-রাত ব্যস্ত থাকত, নানাবিধ অর্থকরী কাজে—এখন বিয়ের পর সুখের ও আনন্দের স্বাদ পেয়েই—আরও দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ শুরু করল, পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

যাদের ভালবাসে তাদের আরও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার তপস্যা এটা।

তাতেই সুনেত্রার আপত্তি।

স্বল্প-পরিসর গৃহে বহু লোকের মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত সে, এত নির্জনতা ও কর্মহীনতা তার সহ্য হয় না।

মামীর বাড়ি হেঁশেলেই বেশির ভাগ সময় কাটত। এখানে কোন কাজই নেই, শাশুড়িই সব কাজ করে নেন প্রায়। বলেন, 'আহা ছেলেমানুষ, ছুদিন হেসে-খেলে নিক। এরপর তো এই বোঝা বইতেই হবে।'

কাজ নেই, অন্য অবসর বিনোদনের উপকরণও নেই।

বই পড়ার খুব একটা অভ্যাস নেই।

একা থাকে বলেই প্রবীর এখান ওখান থেকে বাংলা গল্পের বই নিয়ে আসে, আজকাল ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকেও আনে—কিন্তু সেও বেশী-ক্ষণ ভাল লাগে না সুনেত্রার।

সিনেমা দেখতে পেলে সবচেয়ে খুশী—আইবুড়ো বেলাতে দু-একদিন মাত্র সে অকল্পিত সৌভাগ্য লাভ তার হয়েছিল—কিন্তু এখন কে-ই বা ওকে নিয়ে যাবে?

বিয়ের পর নতুন নতুন দু-একদিন নিয়ে গিয়েছিল প্রবীর—তাতেই নেশা বেড়ে গেছে সুনেত্রার—কিন্তু এখন আর সময় পায় না।

তাও প্রবীরের ইংরেজী ছবির দিকে ঝোঁক। তেমনি আবরু হিন্দী ছবিতে। অথচ সুনেত্রার ঐ দিকেই বেশী আগ্রহ।

অন্তত কোথাও বেড়াতে গেলেও মন্দ লাগে না, কিন্তু কার সঙ্গে যাবে? সপ্তাহে একটিই মাত্র রবিবার—রবিবারে আবার আরও বেশী কাজ পড়ে প্রবীরের। খাতা দেখা, প্রুফ দেখা, কপি লেখা।

সুনেত্রা গোড়ার দিকে কতকটা ভয়ে ভয়েই চুপ করে থাকত।

ক্রমশঃ তার অসন্তোষ সরব হয়ে ওঠে—খবরের কাগজের ভাষায়—সোচ্চার।

সে বলে, 'বলতে গেলে সারা দিনে রাতে তোমার একবার টিকি পর্যন্ত দেখতে পাইনে—ভোরে, সেই সূর্য-অনুদয়ে উঠে ছুটবে ত' টিউশ্যনী করতে, অত সকালে কোন্ ছাত্তর ওঠে তাও জানি না!—মাঝে একবার ঠিক এক মিনিটের জন্যে এসে বাজারটা ফেলে দিয়েই আবার বেরিয়ে যাবে—ফিরে এসে তো আদ্ধেক দিন চান-খাওয়ারই সময় মেলে না। ঘড়ি যেন চোখের সঙ্গে বাঁধা, মন পড়ে আছে সেকেণ্ডের কাঁটায়, খুব বেশী ভাগ্যি হল তো—কুড়ি মিনিট রইলে—তারপর সব কাজ সেরে ফেরা কোনদিন রাত দশটায়, কোনদিন সাড়ে দশটায়—তাও আসবে এক বোঝা খাতা কি একরাশ প্রুফ নিয়ে। কোনমতে খেয়ে উঠেই তো তাইতে মুখ গুঁজড়ে পড়বে—সেই সব ছাই ভস্ময়। আমার দিনটা কি করে কাটে বলতে পারো?—মা তো খুটখাট দিন-রাত্তির ঐ রান্নাঘরেই লেগে আছেন, আমাকে হাঁড়ি-হেঁশেল ছাড়েনও না—কোন কাজও দেন না। দিনের পর দিন হাঁ করে একা বসে বসে শূন্য ঘরে হাপু গেলা—পাগল হয়ে যাবো যে!'

এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না প্রবীর, অপ্রতিভভাবে আমতা আমতা করে বলে, 'তাই তো, তুমি যে আবার বইটইও পড়তে পারো

না ছাই—। আমার তো এ-ই-ই কাজ, আমিই বা সব ফেলে ঘরে বসে থাকি কি করে!'

মাঝে মাঝে সুনেত্রার দিকটাও ভেবে দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে পরের ছুটির দিনটা ওকে নিয়ে একটু কোথাও যাবে।

সত্যিই তো ওর দিনটা কাটে কীভাবে!

কিন্তু তার পরের অনেক ছুটির দিনও কর্মব্যস্ততায় কেটে যায়, সে প্রতিজ্ঞা রাখা যায় না।

আবার দিনরাত ঘ্যানঘ্যানানি শুনতে শুনতে রেগেও ওঠে এক এক সময়ে।

চড়া গলায় বলে, 'তোমার মেসো তো সব জেনেশুনেই আমাকে ইস্কুল মাস্টারের হাতে দিয়েছেন। তুমিও তো জানতে, মাস্টারী করে সংসার চালাতে হলে দিনরাতে ছুটি কতটুকু থাকে—তখন বলতে পারো নি কেন? আমি তো সেধে বিয়ে করতে যাই নি—অনেক বাধা দিয়েছিলুম। তিনিই চারিদিক থেকে ধরে-বেঁধে আমার ঘাড়ে এইটি চাপিয়ে দিয়েছেন। তাও তো বলি—বইপত্তর এনে দিচ্ছি পরীক্ষাটা দিয়ে নাও—তাতেও তো নারাজ। তা আমি কি করব বলো।'

ধমক খেয়ে তখনকার মতো চুপ করে যায় হয়ত।

হয়ত একটু চোখের জল ফেলে প্রবীরকে অনুতপ্ত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু সে ঐ সাময়িক বিরতি মাত্র।

মেয়েরা জানে বিরক্তি উৎপাদনই পুরুষের কাছে কার্য উদ্ধারের প্রধান অস্ত্র।

বিরক্তি প্রকাশ হারমানারই পূর্ব পরিচ্ছেদ।

তাই আবার কদিন পরেই গজগজ শুরু হয়ে যায়।

অগত্যা এবার প্রবীরকে এর একটা প্রতিকারের কথা চিন্তা করতেই হয়।

প্রথম দিকে প্রবীর ইচ্ছা করেই সন্তান হওয়া সম্পর্কে কিছু সতর্কতা

অবলম্বন করেছিল।

যেমন ইদানীংকার অধিকাংশ শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রী করে থাকে। বেশী বয়সের বিবাহে এটা করা উচিত নয়—তবু কিছুদিন অন্তত ও দায় এড়িয়ে থাকতে চায়।

বিয়ের পর দুটো চারটে মাস—বা বছর খানেক স্বাধীন থাকবে একটু, হেসেখেলে বেড়াবে স্ত্রী, সন্তান নিয়ে বিব্রত হতে দেবে না—প্রবীরও এইটেই ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এখন দিনরাত এই নিঃসঙ্গতার অভিযোগ শুনতে শুনতে বুঝল সেইটেই ভুল হয়েছে।

স্ত্রীর হেসে খেলে বেড়াতে হলে স্বামী বা নিদেন একটি অনুগত দেওর কাছাকাছি থাকা দরকার।

ওর যখন কোন অবসর নেই, ছোট ভাই তো নেইই—তখন কাজ দিয়েই স্ত্রীকে ভুলিয়ে রাখতে হবে, ব্যস্ত রাখতে হবে।

আর মেয়েদের দিনরাত ব্যস্ত রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হল সন্তান প্রতিপালনের ভার দেওয়া।

ছেলে বা মেয়ে—একটা যাহোক কিছু হয়ে যাওয়া দরকার।

তা হলে তাকে নিয়েই ব্যস্ত ও বিব্রত থাকবে, স্বামীসঙ্গের অভাব বা কাজের অভাব আর অতটা বোধ হবে না।

বরং তখন 'একটু ফুরসুৎ নেই, 'আর পারি না'—এই কথাটাই শুনতে হবে।

কিন্তু সন্তান হলেও সব সমস্যার সমাধান হয় না—সেটা সন্তান হবার পর বুঝল প্রবীর।

ছেলেই হল ওদের, সোনার পুতুলের মতো ফুটফুটে খোকা একটি।

জীবনের আর একটা বৃহৎ দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল এতে।

স্বার্থত্যাগের আত্মত্যাগের বিরাট একটা উপলক্ষ।

ভালবাসার পাত্রের জন্য নিজের সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিতে না পারা পর্যন্ত মানুষ শান্তি পায় না।

তার জন্য দুঃখ ভোগেই আসল সুখ।

'পরাণ আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়'—কবির বাণীর সত্যতা নিজের জীবনে নতুন করে উপলব্ধি করে আবার।

ছেলেকে সুখী করতে,তাকে সুস্থ রাখতে আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়, যেটাকে অন্য সময় হলে,অন্য ক্ষেত্র হলে বিলাসের প্রয়োজন ভাবত প্রবীর।

তাই এখন আরও বেশী করে খাটে, ভূতের মতো।

নিজের দিকে একবারও তাকায় না। অনবসরকে আরও নিরন্ধ্র করে তোলে।

ফলে আরও সময়াভাব। এধারে ছেলেকে নিয়ে একা সুনেত্রা হিমশিম খায়।

শুধু তাই নয়, তার পায়ে বেড়িও পড়ে।

কোথাও বেরোতে পারে না, সিনেমা থিয়েটার—এমন কি বেড়াতে যাওয়াও বন্ধ।

শাশুড়ির শরীর ভাল নয়—তার ওপর দুবেলা রান্না ছাড়াও সংসারের যাবতীয় কাজ এসে পড়েছে তাঁর ওপর।

একা নাতির খেদমৎই অজস্র।

এর ওপর তিনি তিনচার ঘণ্টা ছেলে সামলাতে রাজী নন।

তা ছাড়া কোলের ছেলে ফেলে অতক্ষণ বাইরে কাটাবে বৌ, এ তাঁর পছন্দ নয়, সেটা তিনি স্পষ্ট বলেও দিয়েছেন।

ফলে আরও যেন তিক্ত হয়ে ওঠে সুনেত্রা।

তার মেজাজ রুক্ষতর হয়।

এখন ছেলে হবার পর আর ভয়ের ভাবটাও ছিল না—সে রুক্ষতা ঢাকবারও বিশেষ চেষ্টা করে না।

এমন কি এখন আর শাশুড়িকেও ভয় করে না।

বাইরে অমানুষিক পরিশ্রম আর ঘরে অশান্তি—সহ্যের বাইরে চলে যায় ক্রমশঃ প্রবীরেরও।

কেবলই মনে হয় যদি ওর একটা মাসতুতো পিসতুতো ভাইও থাকত —সুনেত্রার একটি দেওর!

তার সঙ্গে কিছুক্ষণ হাসি-গল্প করে খুনসুটি করে সময় কাটাতে পারত, প্রবীরের অভাব অতটা টের পেত না।

৫

ভাগ্যবিধাতা যেন প্রবীরকে উপহাস করতেই বা তার আশা ও প্রার্থনা নিয়ে তামাশা করতেই—একটি পাতানো মাসতুতো ভাই পাঠালেন ওদের জীবনে।

বাড়িও'লা ভবেশ।

মানে আইনত সে-ই বাড়িও'লা।

কারণ এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া পর্যন্ত ভবেশকে ওরা দেখে নি বিশেষ। একবার বোধহয় প্রবীরের বিয়ের সময়ই দিন-দুই এসে ছিল—তাছাড়া কখনও কখনও এক-আধ ঘণ্টার জন্যে আসত ও চলে যেত।

নিজের বাড়ি। বিশেষ মা আছেন যখন—তখন বাড়িতে কেন দেখা যায় না—এ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

কী করে, কোথায় থাকে—সে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর মেলে নি।

ভবেশের মাকে প্রবীর মাসীমা বলত। মাসীমা মুখটা যতদূর সম্ভব নিরাসক্ত রেখে উত্তর দিতেন, 'গাড়ি চালানোর কাজ তো, ট্যাক্সি চালায়। তা ওর ঝোঁক একটু দূরে দূরে যাওয়ার—তেমন দূরে কোথাও গিয়ে পড়লে আর ফিরতে পারে না। তা ছাড়া, ওর সব বড় বড় লোক বন্ধু, বেশির ভাগ তারাই ধরে নিয়ে যায়—সেইখানেই থেকে যায় হয়ত কদিন। আর বলবেন না, চিরদিন ঐ স্বভাব, তেমনি সব হয়েছে বন্ধুর দল, কী যে পায় ওর মধ্যে—সব্বাই টানাটানি করবে, সব্বাই চায় তাদের বাড়িতে থাক। কবে যে বে-থা করবে ঘরবাসী হবে তা জানি না।'

কণ্ঠস্বর যতই নিরাসক্ত করার চেষ্টা করুন ভদ্রমহিলা—কোথায় যেন একটু বেসুর বাজে, সেটা কোন বুদ্ধিমান শ্রোতার কাছেই চাপা থাকে না।

তবে কেন বেসুর বাজে, কোন্ বন্ধু ওর মতো ট্যাক্সী ড্রাইভারকে ধরে রাখার জন্যে এমন টানাটানি করে যাতে দুমাস তিনমাসেও একদিন বাড়ি আসতে পারে না—নিজের অসংখ্য সমস্যা ও সীমাহীন কাজে বিব্রত প্রবীর তা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করে না।

করলেই ভাল হত।

মানুষটাকে চেনবার, সতর্ক হবার সুযোগ পেত।

সেটা যখন বুঝল তখন বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে, ভুল শোধরাবার আর সময় নেই।

গোড়ার দিকে বরং ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক প্রবীর সেই ভুলটাকেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করেছিল।

হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল ভবেশ ঘরবাসী হয়েছে।

ইচ্ছা করে নয়—জখম হয়ে।

একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে বলেই বাড়িতে থাকা দরকার, মা ছাড়া এত সেবা করবে কে ?

প্রথমটা স্বভাবতঃই মনে হয়েছিল—কোথাও য়্যাক্সিডেণ্ট করে এসেছে গাড়ির, ভবেশের মাও সেই কথাই বলেছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু কয়েকদিন পরে ওর স্বমুখেই প্রকাশ গেল যে—দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে ঠিকই, তবে সে দুর্ঘটনা স্বেচ্ছাকৃত।

মার কাছে যেটা লজ্জাজনক, ছেলে তাতে লজ্জা পাবার বা গোপন করার কোন কারণ খুঁজে পায় নি। পুরুষ মানুষের পক্ষে একটা গর্বের ব্যাপার বলেই মনে করেছে বরং—

মারামারি করতে গিয়েই গুরুতর চোট পেয়েছে, ছোরা ও লোহার

ডাণ্ডা—ছুটোতেই।

এই ধরনের মারামারি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা যে ওর পক্ষে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়—তা অবশ্য ওকে দেখলেই বোঝা যায়।

একহারা লম্বা চেহারা, চোয়াড়ে ধরনের মুখ, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ; সমস্তটাতেই একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভাব, চালচলনে কথাবার্তায়—এমন কি দাঁড়ানোর ভঙ্গীটাতে পর্যন্ত।

দেখলেই মনে হয় সর্বদা একটা ঝগড়া বাধাবার তাল খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর ঝগড়ার পথ পেলে মারামারিতে পৌঁছতেও কিছুমাত্র দেরি হবে না।

প্রথম কদিন একেবারেই শয্যাগত হয়ে ছিল, তখন প্রবীর ও তার মা বাইরে থেকেই উঁকি মেরে দেখে কুশল প্রশ্ন করে দায় সারত।

সৌজন্যের দায় এটা। সামাজিক ঋণ শোধ।

তারপর একটু সুস্থ হতে যখন ঘরের বাইরে দাওয়ায় এসে বসতে লাগল, তখন একই অপরিসর বাড়িতে থেকে এঘর ওঘর করার সময় চোখোচোখি হওয়াটা এড়ানো সম্ভব নয়।

একটা দুটো কথা থেকে আলাপ, আলাপের পুনরাবৃত্তি।

সে আলাপ সুনেত্রার সঙ্গেও হবে—এও ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি।

তবু তখনই কোন অশোভন অন্তরঙ্গতার চেষ্টা করে নি ভবেশ।

সারাদিন বাড়ি থাকতে হলে যেটুকু গল্পগুজব অনিবার্য—তার বেশি নয়।

সেজন্যে তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় নি।

সে প্রয়োজন আছে তাও কারও মনে পড়ে নি।

কেউ কারও ঘরে যেত না।

একজন বসে আর একজন দাঁড়িয়েই কথাবার্তা হত, দ্বিতীয় ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে হয়ত বসতও—কিন্তু সেও দূরে, নিজের ঘরের চৌকাঠে।

খোকাকে আদর—সেও ভাসা ভাসা, দূর থেকেই।

খোকা যেতও না ভবেশের কাছে, কোলে করলে খুব ককিয়ে কেঁদে উঠত।

শুধু সুস্থ হয়ে আবার যখন কাজে বেরুতে শুরু করল ভবেশ, তখন দেখা গেল যথার্থ অর্থে ই সে ঘরবাসী হয়েছে এবার।

মানে এখন আর তার বন্ধুরা তাকে ধরে আটকে রাখে না, প্রতি রাত্রেই বাড়িতে ফেরে।

শুধু তাই নয়—সকালে উঠেও চা খাওয়া উপলক্ষ করে বেশ একটু দেরি করেই বেরোয় এবং দুপুরেও প্রায়ই বাড়িতে খেতে আসে।

গাড়ি নিয়েই আসে, সে গাড়ি চাবি দেওয়া অবস্থায় বাড়ির সামনের রাস্তায় পড়ে থাকে কিন্তু ভবেশের বেরোবার কোন তাড়া দেখা যায় না।

ঘণ্টা দুই দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করে তবে বেরোয় সে।

যেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারত—মানে ভবেশের এত দিনের জীবনযাত্রার তুলনায়, সেটাকেও কেউ কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে ভাবতে পারে নি।

বরং ভবেশের মা ছেলের অনুপস্থিতিতে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে একটা চোখ টিপে বলেন, 'মনে হচ্ছে ছেলের এবার বে করার ইচ্ছে হয়েছে। বলি বন্ধু-বান্ধব ইয়ারবগ্‌গ যত বড় বড় লোকইহোক—বে'র সময় মা-ভাই-বাপ, ঘর বাড়ির দরকার। রাস্তায় রাস্তায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ালে বে'র কথা হয় না, কেউ মেয়ে দেয় না, আত্মীয়স্বজন ঘরবাড়ি না দেখে।'

এটাই স্বাভাবিক, এমন কি প্রবীরের মাও তাই ভেবেছিলেন।

আরও কিছুদিন পরে ভবেশের আরও সুমতি দেখা দিল।

এতদিন রোজই নাকি নিজে গাড়ি চালাত সে।

প্রবীর একদিন মন্তব্য করেছিল, 'তবে যে শুনেছি ট্যাক্সী ড্রাইভারদের রোজ গাড়ি চালাতে দেওয়া হয় না—স্বাস্থ্য ভেঙে যায় বলে—একদিন অন্তর গাড়ি ধরে তারা—?'

তাতেতাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল ভবেশ, 'সে যাদের এতটুকু বুকের ছাতি, এক-ছটাকে কাঁপা—তাদের জন্যেই ওসব নিয়ম। আমরা দাদা আপনার আশীর্বাদে চিরকালইতো নিত্য গাড়িচালাচ্ছি। কৈ, অসুবিধে তো হয় নিকখনও। বেশির ভাগ জোয়ান ড্রাইভারইতাই। কোন কোন মালিকই বরং অসুবিধে করে বটে, পর পর দুদিন গাড়ি ধরতে দেয় না, অনেকে নিজেরাই চালায় একদিন করে—সেসব জায়গায় ড্রাইভাররা লুকিয়ে অন্য গাড়ি ধরে।'

সেই ভবেশই একদিন প্রবীরকে ডেকে বললে, 'না দাদা, ভেবে দেখছি আপনার কথাই ঠিক। শরীর নষ্ট করা—দশ বারোটা কি পনেরোটা টাকার জন্যে, কোন কাজের কথা নয়। আগে অতটা বুঝি নি, এখন এইকদিন বাড়িতে থেকে আরও—।...না, ও আমি একদিন করে বাদই দেব মধ্যে মধ্যে।'

শরৎচন্দ্র বলে গেছেন, 'সৎপরামর্শ সেই জিনিস যা কেউ শোনে না'। অতটা না হ'লেও সাধারণত লোকে সৎপরামর্শ শোনে কদাচিৎ, কেউ শুনলে তাই পরামর্শদাতারা খুশী হয়।

প্রবীরও—ভবেশ সম্বন্ধে এমন কোন ঔৎসুক্য বা দুশ্চিন্তা না থাকলেও —খুশী হল।

তার এই সুবুদ্ধির পিছনে কোন গূঢ়ার্থ বা মতলব থাকতে পারে তা কর্মব্যস্ত প্রবীরের মনে হল না একবারও।

তার জীবন মানবমনের অন্ধ গভীরে কখনও ঢোকে নি, সুতরাং এত তলিয়ে ভাবার কথাও নয় তার।

শুধু তাই নয়। বাড়ি থাকলে ভবেশ এটা ওটা ফাইফরমাশ খাটে ওদের —ওদের বলতে সুনেত্রারই বেশির ভাগ,—খোকাটাও আজকাল ওকে দেখে অত আঁৎকে ওঠে না, কোলে যায়।

'টা-টা যাবি?' বললে তো কথাই নেই, ভবেশও সেই ঘুষ দিয়ে কোলে করে ঘোরায়ও খানিক—সুনেত্রাকে একটু অবসর দিতে।

সবটা জড়িয়ে প্রবীরের আরও নিশ্চিন্ত হবার, আরও খুশী হবার কথা। হয়ও তাই।

সুনেত্রা যে আজকাল আগের মতো অবিরাম খ্যাচ খ্যাচ করে না, ওর সহকর্মী মনমোহনবাবুর ভাষায় 'ন্যাগিং' ; মনমোহনবাবু বলেন,'ওআই-ফের দিনরাত ন্যাগিং আর সহ্য হয় না ব্রাদার। হোম-এ পীস বলতে কিছু নেই, এক মিনিটের জন্যেও শান্তি নেই—নো, নট্ ফর এ সিঙ্গল মোমেণ্ট। মাঝে মাঝে লোভ হয় টু টেক্ অ্যান ওকার রোব য়্যাণ্ড লীভ্ দ্য হাউস্, লাইক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। মাইরি বলছি, বিলীভ্ মি!' —সেও একটা মহাশান্তি।

খাটতে প্রবীর রাজী আছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো বিশ ঘণ্টা, যদি গৃহে একটু শান্তি থাকে।

না, স্ত্রীব সাহচর্যে বা সেবাতেও প্রয়োজন নেই—খোকার হাসিতেই সব ক্লান্তি চলে যায়, নতুন জীবন ফিরে আসে।…শান্তি সুখের স্বপ্ন দেখে। কঠোব পবিশ্রমের শ্রান্তি অপনোদন করে কদাচিৎ কখনও ট্রামে-বাসে বসতে পাবাব সৌভাগ্য হলে—পাঁচ দশ মিনিট ঘুমিয়ে নেয়।

প্রবীর সবই ভেবেছিল, শুধু ভেবে দেখে নি তার অদৃষ্টদেবতার কথাটা। তার জীবনে সুখ আব শান্তি যে তিনি লেখেন নি সেই কথাটাই বুঝতে পারে নি।

ইংরেজী প্রবচনের ভাষায়—মালিককে বাদ দিয়ে তাই শুয়ার গুণে গিয়েছিল মনে মনে।

সুনেত্রার এই আপাত শান্ত ও সন্তুষ্ট আচরণের কারণটা কি—তা নিয়ে মাথা-ঘামানো বা দুশ্চিন্তাব যে কোন প্রয়োজন আছে তা তার মাথাতেও যায় নি।

যাওয়া সম্ভবও নয় বোধহয়।

সে নিজের মানসিক স্তর থেকে যতই নিচে নামুক সুনেত্রার স্তরে নেমে আসা তার পক্ষে সম্ভব হ'ত না কোনদিনই।…

৬

ঘটনাটা হঠাৎই ঘটল।

একেবারেই আকস্মিকভাবে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কি একেই বলে ?

কে জানে, এটা বজ্রাঘাতের মতো সামান্য জিনিস কিনা।

কোন প্রস্তুতি তো দূরের কথা, এ পক্ষে কোন সন্দেহ এমন কি কিছু বিরক্তি পর্যন্ত দেখা দেবার আগেই।

প্রবীরের মা পর্যন্ত এ সম্ভাবনাটা ভাবতে পারেন নি।

নিজে মেয়েছেলে হয়েও মেয়েমানুষের প্রবৃত্তির তল পান নি।

যেদিন পেলেন, সেদিন আর সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সময় তাঁর রইল না।

প্রবীর ইদানীং স্কুলের ফেরত সব দিন বাড়ি ফেরে না।

ববং বলা উচিত প্রায়ই ফেরে না।

শুধু যেদিন প্রকাশকের ওখানে যাওয়ার কোন দরকার থাকে না, সেদিনই একবার ক'মনিটের জন্যে বাড়ি আসে, চা জলখাবারও খায়।

কিন্তু সে সুখের দিন কদাচিৎ কখনও দেখা দেয়।

কোন প্রুফ কি কপি দেবার বা নেবার প্রয়োজন হবে না—এমনটা প্রায়ই হয় না।

হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। সংসারের মোটা খরচটাই ওখান থেকে আসে। কাজ কমলে দুশ্চিন্তায় বুক কাঁপে।

সেদিনও কাজ ছিল, তবে খুব বেশী নয়।

তবু, কলেজ স্ট্রীট থেকে এতটা এসে আবার শিয়ালদার ডিকশ্যন লেনে পড়াতে যাওয়া—শুধু এককাপ চা আর তার সঙ্গে হয়ত দু টুকরো পোড়া পাঁউরুটির জন্যে (যে নিয়মিত আসে তার জন্যে অন্য খাবার করে রাখা সম্ভব, সেক্ষেত্রে আর পাঁউরুটি ছাড়া গতি কি ?)—মজুরী পোষায় না।

ছেলের হাসি দেখার জন্যেও না।

আজকাল আবার সেও বিপদ হয়েছে। গেলেই ছেলে কোলে চড়ে এবং তারপর আর নামতে চায় না, ছাড়িয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

কঠিন আরও এই জন্যে যে, তারও ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করে না।

মনে হয়, যা হবার হোক আজ অন্তত এর মুখের হাসি অব্যাহত থাক।

সুতরাং এমনিই একটু পথে পথে ঘুরে বেশ কিছুটা আগেই পড়াতে গেছে, সেখান থেকে বেরিয়েছেও অভ্যস্ত সময়ের কিছু আগে।

তাই মা যে একটি পাড়ার ছেলেকে দিয়ে প্রকাশকের কাছে টেলিফোন করিয়েছেন, সেখানে না পেয়ে একজনকে ডিকশ্যন লেনে পাঠিয়েছেন—এসব কোন খবরই পায় নি।

নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি ফিরছিল সে।

কখন খোকাকে গিয়ে দেখবে সেই কথাটাই চিন্তা করতে করতে।

ফেরার পথে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মার সঙ্গে দেখা হল।

উদ্বিগ্ন মুখে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সাধারণ অসুখ বিসুখের চেয়েও বেশী কোন বিপদ নিশ্চয়ই—দাঁড়াবার ভঙ্গীতে অপরিসীম উদ্বেগ ও অস্থিরতা—যেন ছুটে কারও কাছে যেতে চান তখনই।

ভঙ্গীটাই চোখে পড়ল, তার কারণ রাস্তার আলোতে মুখভাবটা পরিষ্কার দেখা সম্ভব নয়।

দেখা গেলে, লক্ষ্য করতে পারলে, বুঝত যে তাঁর মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে উঠলেও দৃষ্টিতে বিপদের বিহ্বলতা ও আশঙ্কার চেয়ে কুটিল কোন সংশয়ের চিহ্নই প্রকট।

তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'এ কী, তুমি এখানে ? কি হয়েছে—খোকার—খোকার—'

ওর সর্বপ্রধান ও সর্বাগ্র চিন্তা খোকার জন্যেই, তাই প্রশ্নটা করতে গিয়েও পুরো করতে পারল না।

নানা রকম ভয়াবহ বিপদের কল্পনায় জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

খোকার কথাটাই সমস্ত মনকে অমন আচ্ছন্ন করে না রাখলে মায়ের ভ্রূকুটি আর চোখের চাহনি নজরে পড়ত—বুঝত যে ব্যাপারটা আর যা-ই হোক, ও ধরনের সাধারণ কোন ঘটনা নয়।...

মা কোন ভনিতা করলেন না।

সে সময়ও ছিল না।

তাছাড়া তিনি অনেক বাগাড়ম্বরের পর বক্তব্যে পৌঁছনো পছন্দও করেন না।

সোজাসুজিই বললেন, 'না, খোকা ভাল আছে। বৌমা—বৌমাকে দুপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না!'

কিছুটা স্বস্তি বোধ করে বৈ কি।

কণ্ঠস্বরেও সে ভাব চাপা থাকে না।

বলে, 'পাওয়া যাচ্ছে না ? তার মানে ? আশপাশে কোথাও গেছে হয়ত, ননীদের বাড়ি কিংবা বিশুদের ওখানে— ? একা আর কোথায় যাবে ? কখন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—মানে দেখতে পাচ্ছ না ?'

খাপছাড়া খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন করে।

গুছিয়ে প্রশ্ন করবে যে মন—সে তখন মার ঐ ভ্রূকুটি ও কণ্ঠস্বরের অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

মা বললেন, 'দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর শুয়েছি—যেমন রোজ শুই, বৌমাও ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে দেখেছি। আড়াইটে নাগাদ খোকার চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি তোদের ঘরে শিকল তোলা বাইরে থেকে—ছেলেটা ভেতরে চিল-চেঁচাচ্ছে—দ' পিটছে যাকে বলে—তাড়া-

তাড়ি শেকল খুলে ওকে কোলে নিই। তখনও ভাবছি বৌমা হয়ত পাইখানা টাইখানায় গেছে কোথাও, কি বাইরে কোন ফিরিওলা ডেকে জিনিস কিনছে। দশ-পনেরো মিনিট পরেও যখন ফিরল না তখন খোঁজ-খবর করে দেখি কেউ কোথাও নেই। আশপাশের সব বাড়িতেই খোঁজ নিয়েছি, বিশুদের ওখানে কেন—কেলো-কচানদের ওখানে, টুলুদের বাড়ি, নাগেদের নন্দীদের—কোথাও যায় নি। সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত দেখে মজুমদার লাইব্রেরীতে ফোন করালুম গোপাকে দিয়ে, তুই তখন বেরিয়ে গেছিস। ওর ভাই তপুকে বলে কয়ে পাঠালুম ডিকশুন লেনে—ও যেতে যেতে সেখান থেকেও নাকি বেবিয়ে পড়েছিস। আব কিছু নয়, সকাল করে এলে একটু খোঁজখবর করতে পারতিস—এখন তো রাত দশটা বাজে।'

'খোঁজখবর কোথায়ই বা কবব মা। আচ্ছা, ওর মাসীর বাড়ি—সেখানে কারও অসুখ-বিসুখ শুনে চলে যায নি তো?

'সে গেলে—ঐ ভাবে, আমাকে না বলে, ঘরে শেকল তুলে দিয়ে চলে যাবে? ছেলেকে ঐ ভাবে ফেলে বেখে? কী বলছিস তুই। অসুখের খবব নিয়ে যে আসবে সে তো একটু অন্তত থাকবে, আমার সঙ্গে একবাব দেখা কববে না? সে তো বলেকয়েই যাবার কথা। আমি কি তাকে আব আটকাতুম?'

তাবপরই হঠাৎ একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসলেন, 'ভবেশ আজ দুপুরবেলা খেতে আসে নি। ওব মাও হানটান করছে। না খেয়ে ভাত কোলে কবে বসেছিল বেলা চারটে পর্যন্ত।'

কথাটার সূত্র খুঁজতে—দুটো সংবাদের মধ্যে যোগাযোগটা বাব করতে একটু সময় লাগে বৈকি।

প্রথম সংবাদের আকস্মিকতাটা তখনও যথেষ্ট বিহ্বল করে রেখেছে—তাই ভবেশের বাড়ি না আসার প্রসঙ্গটা এই খবরের মধ্যে উঠল কেন—ভেবে পায় না অনেকক্ষণ।

তবু বাড়ির দিকে বাড়ানো পা থেমে যায়।

কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করে।

তারপর একটু যেন চেষ্টাকৃত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, 'তা সে তো অমন কতদিনই আসে না। তার জন্যে আমার মাথাব্যথা কি?'

'উঁহু। এদাস্তে একদিনও আসার কামাই ছিল না। ওর মাও তো তাই বলছে। এ বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকত বেলা সাড়ে চারটে পর্যন্ত। ওর মা তো এখন যে রকম বাঁকা বাঁকা কথা বলছে—মনে হচ্ছে অন্য সন্দেহ করছে। বৌমাকেই—।...তুই একবার প্যাঁড়াটা খুলে ছাখ তো বৌমার তোলা হারছড়াটা আছে কিনা—আর ভাল শাড়িগুলো।'

এবার আর যোগাযোগটা অস্পষ্ট থাকে না।

মার বক্তব্যের সরল অর্থ টাকেও আর জোর করে দূরে ঠেলে রাখা যায় না।

না বোঝার ভাণটা বার করা যায়, নিজের কাছে করবে কেমন করে?

পাথর হয়ে যায় পা-ছুটো।

সেই সঙ্গে মনটাও।

কী করবে, মার পরামর্শই শুনবে কিনা--কিছুই যেন মাথাতে যায় না।

গুছিয়ে ভাবতে পারে না কিছু।

এ ধরনের কোন চিন্তা কখনও করে নি সে।

কখনও মাথাতেও যায় নি।

সুদূর কল্পনার মধ্যেও ছিল না এ সম্ভাবনাটা।...

অনেক—অনেকক্ষণ সময় লাগে কথা বলার শক্তি ফিরে পেতে।

আসলে নিজেকেই প্রতারিত করতে চাইছে সে, না বোঝার চেষ্টা করছে তখনও।

কেমন একরকমের স্খলিত—নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকে এমন কণ্ঠে বলে, 'না না, যাঃ! কী বলছ। ঐ চোয়াড় ছোটলোকটা। গুণ্ডা, বদমাইশ! যাঃ! ছি ছি। তা কেন হবে।...তা তুমিও তো বাক্সটা

খুলতে পারতে, যদি অতই তোমার সন্দেহ হয়ে থাকে।...চাবি কোথায়? তার কাছে বুঝি?'

'না। সেটুকু দয়া করে বালিশের তলায় রেখে গেছে। খুলি নি এমনিই। আমার যেন সাহসে কুলোচ্ছে না—কী দেখব এই ভেবে।'

তারপর যেন সচকিত হয়ে ওঠেন।

'চ, বাড়ির ভেতরে চ। এখানে দাঁড়িয়ে আর কি হবে। ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি, কচানদের বাড়ির ভারুকে বসিয়ে, তবু উঠে পড়লেই কাঁদবে। এমনিতেই—যতই আমার কাছে থাক, দুধের ছেলে, সে কখনও এতক্ষণ মাকে না দেখে থাকতে পারে?—সন্ধ্যেবেলা কিছুতে ঘুমোবে না, কেবল বলে, মা, মা যাবো, মা যাবো—'

অগত্যা বাড়িতে যেতে হয়।

ভারী পা টেনে টেনে নিয়ে।

হাত পায়ে জোর নেই আর হাঁটু দুটো ভেঙে আসছে।

বুকের মধ্যেটায় কাঁপছে অল্প অল্প। তাতেই আরও জোর পাচ্ছে না।

তবু ঘরেও পৌঁছয় এক সময়।

বাক্সটাও খুলতে হয়।

সত্যিই সে হার নেই। সেই সঙ্গে সিল্কের শাড়ি দুটোও উধাও, সম্ভবতঃ দু একখানা ভাল তাঁতের শাড়িও।

প্রবীরের অত হিসেব নেই, তবে ওর মায়ের আছে।

বাক্সটাও যে অনেক খালি তাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাগারাগি?

কোন ব্যাপারে মন কষাকষি হয়েছিল?

কথা-কাটাকাটি?

অনেক চেষ্টা করেও তেমন কোন ঘটনা মনে করতে পারে না প্রবীর। চেষ্টা, হ্যাঁ চেষ্টাই করে। এই ধরনের সম্ভাবনার মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে চায়।

সেই প্রায় অসম্ভব সম্ভাবনাকে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরার জন্যে প্রাণপণ করে।

জানে কোন আশা নেই, তবু একবার সুনেত্রার মেসোর বাড়ি যেতে হল খোঁজ করতে।

কতকটা কর্তব্যের খাতিরেই।

তাঁরা কিছু জানেন না, তবে আন্দাজ করতে পারেন।

অথবা বলা চলে আন্দাজটা বহু পূর্বেই করে রেখেছেন।

অর্থাৎ দেখা গেল যে প্রবীরের অন্তঃপুরের খবর ওঁর থেকে তাঁরা বেশী জানেন।

ভবেশের আকস্মিক গৃহপ্রীতি সম্বন্ধে প্রবীর সচেতন নয়, কিন্তু সংবাদটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে, এখানে এঁদের কাছেও পৌঁচেছে এবং আলোচ্য হয়ে উঠেছে।

অন্যের কাছে মুখরোচক—এঁদের কাছে অপ্রীতিকর আলোচনাটা।

এ প্রীতি গৃহ না কোন গৃহবাসিনী সম্বন্ধে—আলোচনাটা সেই বিষয়ে।

অথবা আদৌ আলোচনার প্রয়োজন হয় নি।

তার আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন সবাই।

শুধু প্রবীরকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন কিনা সেইটেই বুঝতে পারেন নি।

হয়ত চক্ষুলজ্জায় বেধেছে—কেমন করে কথাটা পাড়বেন সেইটেই ভেবে পান নি।

এখন তাঁদের অনুমানটা সমর্থিত হতে জোর পান ধিক্কার দেবার।

নিজেদের বুদ্ধির অহঙ্কার চরিতার্থ হওয়ার নেশায় ধিক্কারে মুখর হয়ে ওঠেন।

প্রবীর এত লেখাপড়া করেছে বা করে এখনও—দুই আর দুইয়ে চার

—এই সোজা অঙ্কটা কষতে পারে নি ?

যে ঘর শাসন করতে পারে না—সে এতগুলো ছেলেকে শাসন করতে যায় কোন্ অধিকারে ?...

কিছুই তো জানে না সে, কোন জ্ঞানই তো হয় নি এখনো।...

আর কোথাও খোঁজ করতে যায় নি প্রবীর।

এবার চোখ খুলেছে।

খবর নিতে গেলে কী জবাব পাবে—প্রতিবেশীদের চোখে মুখে করুণা-মিশ্রিত বিদ্রূপের হাসিতে তা বুঝতে পেরেছে।

সে হাসি সুতীক্ষ্ণ তীরের মতো এসে বিঁধে বুঝিয়ে দিয়েছে।

বুঝিয়ে দিয়েছে নিজের মূর্খতা, সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথাটাও।

তা ছাড়াও খবর পেয়েছে।

নিত্যই পাচ্ছে।

খবর পাওয়া বলা হয়ত ভুল। খবর আপনা থেকে এসে পৌঁচচ্ছে।

ভবেশের মা ছড়া কেটে গালাগাল দিচ্ছেন।

হারামজাদী ডাইনী, খানকীর ঘরের খানকী, ফাঁদ পেতে 'গুণ' করে তাঁর কচি ছেলের সর্বনাশ করেছে।

ভাল হবে না ওদের ভাল হবে না।

ঝাড়ে বংশে এমনি কাঁদবে বসে বসে, তিনি যেমন কাঁদছেন।

'ঘরের মধ্যে এইসব রাসলীলে বেলেল্লাপনা চলছিল—ওই ঘাগী মেয়ে-মানুষ খানকীর শাশুড়িমাগী কিছু বুঝতে পারে নি! ন্যাকা! তা নয়, ভেবেছিল ঐ খানকী বেবুশ্যে বৌকে টুইয়ে দিয়ে বেশ করে দুয়ে নেবে ছেলেটাকে। কাঁচা পয়সা, সেটা বেশ বুঝেছিল তো।' মাস্টার মিন্‌সে সংসার টানতে পারে না তাই বৌকে দিয়ে রোজগার করায়। তা করাস করা—বাজারে গিয়ে ঘর ভাড়া করতে পারিস না? না পাড়ায় বড়-

লোক চাক্‌রে বাবুর অভাব আছে কিছু? আমার ঐ বিধবা বেওয়ার একটা ছেলের দিকে নজর দেওয়া কেন বাপু! ওর মাথাটা এমন ভাবে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে না খেলে চলছিল না?—আমার ছেলেটাও যে হয়েছে তেমনি বেহদ্দ বোকা—তাই আবার ঐ খান্‌কী মাগীকে নিয়ে পালাল। দুটো টাকা ফেলে দিলে যাকে ঘরে বসে পাওয়া যায় তাকে নিয়ে আবার ঘর ভাড়া করার কী ছিল!'

এরপর এ বাড়ি ছেড়ে এ পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত।

নইলে হয়ত প্রবীরের অখণ্ড ধৈর্যেরও একদিন অবসান হবে, হয়ত বা আত্মহত্যাই করতে হবে তাকে।

তা-ই হয়ত করত। এই লজ্জা ও গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে—ছেলেটার জন্যেই পারে না।

পারে না মার জন্যও।

তিনি যেন আরও ভেঙে পড়েছেন।

মজাই এই—যার দায়িত্বজ্ঞান আছে সে যত আঘাতই পাক—যত বিপদ, যত লাঞ্ছনার মধ্যে পড়ুক—দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করতে পারে না।

এ জীবন এ সংসার থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিতে গিয়েও দায়িত্বের দিকে তাকায়।

মরে গেলে সে দেখতে আসবে না আর এ কথা মাথায় যায় না।

তার থেকে যেটা সম্ভব—সেই চেষ্টাই করে।

প্রাণপণে বাড়ি খোঁজে।

কিন্তু সেটা এখনকার দিনে অত সহজলভ্য নয় বলেই পায় না—বিশেষ ওর ক্ষমতায়—পড়ে মার খায়।

আবার এক এক সময় ভাবে—কোথায়ই বা যাবে।
সহকর্মী, ছাত্র—কারুরই তো জানতে বাকী নেই।
তারা ওকে ভালবাসে বলে কিছু বলে না, কিন্তু তাদের দৃষ্টির অনুকম্পা ও সমবেদনা সরব ধিক্কারের থেকে বেশী বাজে।
সেই সময়গুলোয় মনে হয়—সেই মুহূর্তে মরে যাবার তুল্য সুখ নেই।
সব ছাত্র সমানও নয়—কেউ কেউ এমন মুখরোচক খবরের সুযোগ নেবে না, তা আশা করাও মূর্খতা।
সে সুযোগ তারা নেয় ষোল আনাই।
ব্ল্যাকবোর্ডে চক-খড়ি দিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য লিখে রাখে, দেওয়ালে দেওয়ালে কবিতার জন্ম হয়।
কেউ বা হোমটাস্কের খাতার মধ্যে চিরকুটে ছড়া লিখে রেখে দেয়।
তাতে নামধাম থাকে না কিছু, আইনে ফেলা যায় না।
আর এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে আরও অপমান, আরও লাঞ্ছনা।
নর্দমার তরল পাঁকে ঢিল ছুঁড়লে সে পাঁক ছিটকে নিজেরই গায়ে লাগে.
তাই দাঁতে দাঁত চেপে সয়ে যেতে হয়।
দেখেও দেখে না এসব।
যে ছাত্ররা ভালবাসে—তারা যে প্রাণপণে চেষ্টা করে ওকে বাঁচাতে—কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাও লক্ষ্য করে।
এক একদিন ক্লাসে ঢোকার আগেই দেখে কেউ ছুটে গিয়ে বোর্ড মুছে দিচ্ছে—ডাস্টারের অভাবে নিজেদের রুমাল দিয়ে কিংবা হাত দিয়েই।
সে লেখার দু একটা শব্দ দেখেই বোঝে কী শ্রেণীর রচনা সেখানে লেখা হয়েছিল।
বোঝার অসুবিধাও হয় না।
দেখছে তো নিত্যই।
দেওয়ালের ছড়া আলকাতরায় লেখা, তা অত সহজে মোছা যায় না।
কে-ই বা গরজ করে মুছবে?

"মোহন চোখে ভবের হাতে
মাস্টার বসে নাকে কাঁদে।"
"বৌ পালাল মাস্টার বোকা,
মা কোথা গেল—কাঁদছে খোকা।"
"বৌকে পোষার মুরোদ নেই
হায় রে কপাল—মাস্টার সেই।" ইত্যাদি—

দেখতে দেখতে মুখস্থ হয়ে গেছে।

আজকাল সহজ হয়ে গেছে মনের ভাব, সহনীয় হয়ে উঠেছে আঘাত। বরং নিজেই লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যায়—এইসব লেখার বানান ভুল, ছন্দ ভুল—এমন কি কোন্ শব্দের বদলে অন্য কোন্ শব্দ বসালে আরও তীক্ষ্ণ হত, আরও মজাদার—এও মনে মনে ভাবে।

অবশেষে মজাটা পুরনো হয়ে যেতেই বোধহয় ছেলেরা ক্ষান্ত হয়। উত্তেজনাটা মিইয়ে যায় বলেই।

ক্ষান্ত হন না সম্পূর্ণ ভবেশের মা।

বেশ ক'মাস সময় লাগে তাঁর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে।

শেষ পর্যন্ত ওর মাসশ্বশুর মনোরঞ্জনবাবুই একটা সুরাহা করে দেন। বোধহয় এই ঘটনার লজ্জা তাঁকেও কতকটা আঘাত করে। প্রবীরের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করেন বলেই চেষ্টা উদ্যোগ করে কাছাকাছি একটা ঘর ঠিক করে দেন।

একখানা ঘরই, কিন্তু পাকা এবং বেশ বড় ঘর।

ভাড়া কিছু বেশী—তবে সাধ্যের বাইরে নয়। আলাদা রান্নাঘর নিয়ে আশি টাকা।

কল-পায়খানা আর একঘর ভাড়াটের সঙ্গে ভাগে, কিন্তু সেও—মনোরঞ্জন-বাবু বুঝিয়ে দিলেন—অসুবিধে হবার কিছু নেই।

তাঁরা শুধু স্বামী স্ত্রী, দুজনেই চাকরি করেন।

স্ত্রী কোন্ প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ান, দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়, বেশীক্ষণ কলজোড়া করে থাকার জো নেই।

তাঁদের মারফতই এই ঘর পাওয়া গেছে, তাঁরাও এই রকম ভদ্র প্রতি-বেশী খুঁজছিলেন, মনোরঞ্জনবাবুর মুখ থেকে শুনে বলে-কয়ে বাড়ি-ও'লাকে রাজী করিয়েছেন।

যা ধরে সেই রকম জিনিসপত্রই এখানে তুলে, বাকী সব বেচে বা বিলিয়ে দিয়ে নতুন বাসায় এসে ওঠে প্রবীর।

আর কিছু না হোক ভবেশের মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই সে কৃতজ্ঞ বোধ করে মনোরঞ্জনবাবুর কাছে।

এবার—ক্ষতটা নিরাময় না হোক—তার ওপরে আস্তরণ পড়ার অবসর পেতে পারে।

সেইটুকুই লাভ।

নিঃশ্বাস ফেলার অবসর একটু।

নইলে অপমানের দাহ একটু একটু করে কমে এলেও—সমস্যার কোন আসান হয় না।

ছেলেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শৈবলিনী অনেকটাই সামলাচ্ছেন, তবু মার অভাবে ছেলেটা বাবাকেই যেন বেশী করে আঁকড়ে ধরে, তাকেই চায়।

শৈবলিনীর পক্ষে এই বয়সে এবং এই শরীরে সবটা করাও সম্ভব নয়। কিছু কিছু বাধ্য হয়েই প্রবীরকে করতে হয়।

ফলে রাত্রের দিকে টিউশ্যন কমিয়ে দিতে হয়েছে, সকালে তো করাই চলে না।

বাড়িতে বসে সে সব কাজ করা চলে সেই সব কাজই বেশী করে ধরতে হয়।

ওর কাছে এসব নোটবই লেখা বা পাঠ্যবই লেখার কাজের থেকে টিউশ্যনী অনেক ভাল বোধহয়।

চিরদিনই পড়াতে ভালবাসে সে।
সেইজন্যেই অন্য কোন ভাল চাকরির চেষ্টা করে নি কখনও।
কিন্তু উপায় কি, সকালে খোকা একদমই ছাড়তে চায় না।
তবু তো এখনও চলছে এরকম করে।
শৈবলিনীর যা অবস্থা তিনি আর কতদিন চালাতে পারবেন কে জানে।
শরীর ভেঙে আসবার মতো যথেষ্ট বয়স হয় নি—কিন্তু অন্য কারণে সেটা ভেঙে এসেছে।

বড়ছেলের ব্যবহারে যে অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধ ও কূর্মবৎ আত্মসংকুচিত হয়ে গিয়েছিলেন, তাতেই আশঙ্কার সীমা ছিল না প্রবীরের।
তবু ওর বিয়ের পর বৌ,—বিশেষ নাতি পেয়ে ওরই মধ্যে একটু সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন. এই কেলেঙ্কারির পর আবারও সেই আগের মতো চুপ করে গেছেন, বাইরের জগৎ থেকে যেন গুটিয়ে নিয়েছেন

কাজকর্ম বন্ধ নেই—রান্নাও করেন, নাতিকেও দেখেন—কিন্তু সে সবই করেন কলে চালানোর মতো।
মনে হয় আর কেউ—কোন যন্ত্র চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।
সংকুচিত শুধু মনের দিক দিয়ে চিন্তার দিক দিয়েই নয়—এক এক সময় মনে হয় প্রবীরের—দেহের দিক দিয়েও যেন ছোট হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন, গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেছেন।
মনের আঘাত দেহেও প্রবল প্রতিক্রিয়া আনে—এটা এতকাল বইতে পড়া ছিল, এবার চোখে দেখল।
শুধু তাই নয়, যেটা সবচেয়ে অসহ্য লাগে—আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ হয়—এর জন্যে তিনি ছেলেকেই যেন বেশী দায়ী মনে করেন।
তিনি বোধহয় মনে করেন—ছেলের অকর্মণ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এ ঘটনা ঘটতে পারল।
ছেলে যদি একটু চক্ষুষ্মান হত, বৌকে শাসনে রাখতে পারত তো এমন

ঘটনা ঘটত না।

মধ্যে মধ্যে এমন ইঙ্গিতও দেন যে বৌয়ের দৈহিক ক্ষুধা মেটাবারও যোগ্যতা নেই ছেলের, তাই তাকে সেটা অন্যভাবে মেটাতে হয়।

এই নীরব ধিক্কারটাই বেশী বাজে প্রবীরের।

অথচ এর প্রতিকার কি তাও বুঝতে পারে না।

অকথিত অনুচ্চারিত অভিযোগের উত্তর দেওয়া যায় না।

তাছাড়া ওর মা কোনদিনই ওর মনোভাবটা ধরতে পারেন নি, আজ পারবেন, ওর যুক্তিগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন—সে সম্ভব নয়। তাই সে চেষ্টাও করে না। চুপ করেই থাকে।

এখন শুধু প্রার্থনা—আর কিছুদিন বাঁচুন মা।

অন্তত খোকাটা একটু বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত।

ওর সঙ্গে ইস্কুল যাবার মতো বড় হলেও কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে!···

আশ্চর্য, এই ফুলের মতো, দেব-শিশুর মতো খোকাকে ছেড়ে ওর মা কোন্ প্রাণে চলে গেল!

কিসের লোভে গেল!

কী পাচ্ছিল না এখানে, ঐ লোকটার কাছে সেখানে কী পেল!

এসব অর্থহীন প্রশ্নের কোন সদুত্তরই পায় না মনে—নিজেকেই নিজে অবিরাম প্রশ্ন ক'রে যায় শুধু!

নিজের চিন্তার দুয়ারে মাথা কোটে, নিজেকে জর্জরিত করে।

৭

কিসের লোভে অমন স্বামী, ঐ ফুলের মতো ফুটফুটে শিশু-সন্তানকে ছেড়ে এল—ওখানে কি পাচ্ছিল না, এখানে কি পেল, কি পাবে---এ প্রশ্নের উত্তর কি সুনেত্রাই জানত ?

না, সে উত্তর এখানে এসেই পেল।

আজও তো পায় নি।

কেন এল, কিসের অভাবে আজও তো জানে না।

যেন কী নেশায় পেয়ে বসেছিল ওকে, ভূত চেপেছিল ঘাড়ে।

আসলে বোধহয়—আশার কল্পনার অতিরিক্ত পেয়েই আশা বেড়ে গিয়েছিল, আকাঙ্ক্ষার পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল।

আরও, আরও চাইছিল মন।

হয়ত বা ভদ্র, শান্ত, কর্তব্যপরায়ণ স্নেহময় স্বামীতেই মন উঠছিল না। ওর ভেতরের আদিম বন্য বর্বর নারীসত্তা চাইছিল—সেকালের গুহামানব না হোক---তাবকাছাকাছি জান্তব কোন মানুষ—উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া—নির্দয় নিষ্ঠুর; যে দৈহিক পীড়ন করবে, দুর্ব্যবহার করবে, প্রয়োজন মতো প্রহার করবে - আবার অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষার কামনার অতিরিক্ত প্রণয়ে পুষিয়ে দিতে পারবে, দেবেও।

যার জৈবক্ষুধা কোন ভদ্র সংস্কার নিয়মকানুনের ধার ধারবে না।

নিঃশেষে দেবে, নিঃশেষে নেবে।

ভবেশের ধরনধারণে, উগ্র উদ্ধত কথাবার্তায়, ইতর রসিকতায়—সেই রকমই মানুষ মনে হয়েছিল।

ঠিক হয়ত গুছিয়ে ভাবে নি অতটা। হয়ত নিজের ক্ষুধার পরিমাণও জানত না। প্রবীরের মতো ভদ্র বিবেচক মানুষে মন ভরে না, ওর ভরে নি এইটে জানত। সেই তৃষ্ণাই মেটাতে চেয়েছিল—শরবতে নয়, সুরায়।

কিংবা, হয়ত মেয়েদের কাছে লম্পট পুরুষের একটা চিরকালীন প্রবল আকর্ষণ আছে।

ভবেশের দৃষ্টিতে সেই দুর্নিবার আকর্ষণই অনুভব করেছিল।

আর কিছু ভাবতে চায় নি, ভাবতে পারে নি।

শুধু ওকে চাই, যেমন করেই হোক ; ওর কাছে নির্দয় নিপীড়ন পেয়েও সুখ, ওর দাসীবৃত্তি করেও আনন্দ—এইটেই মনে হয়েছিল।

সে ভুল ভাঙতে অবশ্য বেশীদিন দেরি হয় নি।

সাত দিনও না।

কী চেয়েছিল, কিসের লোভে জীবনের যা কিছু শ্রেয়—সমস্ত ত্যাগ করে চলে এল, এ দুরূহ প্রশ্ন নিরুত্তরিতই থেকে গেল সুনেত্রার কাছে।

বরং আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল নিজের মনোভাবটা নিজের কাছে, আরও দুরুত্তর হয়ে উঠল প্রশ্নটা।···

যোধপুর পার্ক যেখানে টালিগঞ্জের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে সেই রকম একটা জায়গায় একখানা ছিটেবাঁশের-দেওয়াল কাঁচাঘরে এনে তুলল ওকে ভবেশ।

কাঁচা ঘর—কিন্তু অব্যবহার্য নয়। দেখে মনে হল অব্যবহৃতও নয়।

বরং কেউ সদ্য এ ঘর থেকে গেছে, একটু পরেই ফিরে আসবে—সেই রকমই একটা অনুভূতি হল সুনেত্রার।

তক্তপোশে বিছানা পাতা, সে বিছানা নতুন নয়, প্রায় আধময়লা।

মাথার বালিশে তেলের দাগ।

দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা সস্তা দামের আরশিতে মেয়েদের বড় দাড়ার চিরুণী গোঁজা, তাতেও তেলের চিহ্ন, লম্বা চুল লেগে।

বাসনকোসন খুব বেশী নেই—তবু তারও নতুন নয় কোনটা।

চাল ডাল তেল, এমন কি আনাজও পড়ে আছে একটা চুপড়িতে কিছু কিছু—একটু শুকনো, হয়ত দু তিন দিন আগে এসেছে।

কেরোসিন তেলের যে স্টোভটাতে রান্না হয়—তাতে এখনও ডাল ও ভাতের ফেন শুকিয়ে আছে।

কিছুই বুঝতে পারে নি সুনেত্রা, বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

এমনিতেই নিরাপত্তার গণ্ডী পার হবার পরই একটা অস্বস্তি অনুতাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল—যা হওয়া স্বাভাবিক, যা যে কোন মেয়েরই হয়।

'এ কার ঘরে এনে তুললে? যার ঘর সে কোথায়? মনে তো হচ্ছে দুজন থাকে। তারা কোথায় থাকবে এর মধ্যে?'

সুনেত্রা বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করেছিল।

তার জবাবে অসহিষ্ণু ভবেশ ধমক দিয়ে উঠেছিল, 'অত খবরে তোমার দরকার কি চাঁদমণি। যে জন্যে এসেছ সেটা পেলেই তো হল?'

এই বলে সে তখনই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কার বিছানা, ফরসা কিনা, বদলাবার মতো চাদর আছে কিনা এসব প্রশ্ন ওঠাবারই সময় দেয় নি।

তারপর একেবারে সন্ধ্যার সময় ওকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, 'এই ওঠ্, চা কর্ ভাল করে। ঐ কৌটোয় বোধহয় মুড়ি আছে—চাট্টি বার কর। চা চিনি সব আছে, একটা শিশিতে গুঁড়ো দুধও থাকার কথা—খুঁজে দেখ। তারপর ভাত চাপিয়ে দে। শুধু পিরীতে পেট ভরে না। পেটে শালার কুকুরে ডন মারছে। আজ সারা দিনই তো তোর পাল্লায় পড়ে খাওয়া হয় নি, সেই কোন সকালে পাঞ্জাবী হোটেলে দুখানা রুটি খেয়েছি—সে কবে ময়লা হয়ে গেছে।—নে নে, ওঠ। আর পড়ে পড়ে সোহাগ কাড়াতে হবে না।'

তখন বিছানা ছেড়ে ওঠবারই আর অবস্থা নেই সুনেত্রার।

তবু উঠতে হয়।

কাকে কি বলবে।

এর কাছ থেকে কোন সদয় ব্যবহার কি সহৃদয় বিবেচনা আশা করাই মূঢ়তা।

তাছাড়া সে নিগৃহীত নিপীড়িত হতেই তো এসেছে—চরিত্রবান সহৃদয় স্বামী ছেড়ে, নিরাপদ আশ্রয় নিজস্ব সংসার ছেড়ে।

এরপর দুদিন ভবেশ নড়লই না ঘর ছেড়ে।

তার সে সর্বপ্রকার ক্ষুধার চেহারা দেখে ভয় পাবে—সে সময়ও পায় না সুনেত্রা।

ভবেশ পাওনা নগদ আদায়টাই বোঝে, ষোল আনার ওপর আঠারো আনা উশুল করতে জানে সে।

প্রবীরের মুখেই শুনেছিল—আগেকার দিনে মার্কিন মুলুকে যেমন নিগ্রো ক্রীতদাসীদের ওপর কত রকম অকথ্য অত্যাচার হত—কী একটা বই পড়ে গল্প করেছিল প্রবীর—এখন সেটার অর্থ বুঝল।

বুঝল সেটা অতিরঞ্জিত বা অবাস্তব নয়।

নিতান্ত যখন তৃতীয় দিনে ঘরে খাবার মতো, তার চেয়েও বড় কথা নেশা করবার মতো কোন উপকরণও রইল না, তখন বেরোতে হল গাড়ি নিয়ে।

একেবারেই কিছু ছিল না ঘরে।

ভবেশ সন্ধ্যের সময় বাজার করে না ফেরা পর্যন্ত উপবাস করে থাকতে হল সুনেত্রাকে।

এমন খাড়া উপবাস বহুকাল করতে হয় নি—মাসীর বাড়িতে এক আধ দিন যা—শ্বশুর বাড়ি এসে তো নয়ই। যত পরিশ্রম যত কষ্ট করুক প্রবীর—সে নিজেই যতকিছু দুঃখ আত্মকৃচ্ছ্রতা সহ্য করেছে, এদের কখনও আঁচটিও লাগতে দেয় নি।

ছেলে হবার পরে তো উঠবে না—আগেও সে প্রশ্ন ওঠেনি কখনও। ইদানীং সদ্য-প্রসূতির ভাল করে খাওয়া প্রয়োজন বলে ফল দুধ ডিমে ঘর ভরিয়ে রাখত সর্বদা।

সন্ধ্যার সময় বাজার এল—সেও একদিনের মতো।

লক্ষ্মীছাড়ারই বাজার।

খানিকটা মাংস পিঁয়াজ আলু আর খানিকটা আটা।

বললে, 'রুটি মাংস করে রাখ। আমি আবার বেরুচ্ছি, রাত্রে ফিরে এসে খাবো।'

ঘরে কেরোসিন তেল নেই স্টোভ জ্বালাব, সর্ষের তেলও বাড়ন্ত। শিশিতে যেটুকু ছিল কদিন টেনেটুনে চলেছে হতদরিদ্রের সংসারের মতো।

রান্নার অন্য সব উপকরণেরও প্রায় সেই দশা।

সুনেত্রা সেকথা বলতে খিঁচিয়ে উঠল ভবেশ, 'উঃ! তবে আর কি, মাথা কিনেছ আমার। আমার এখন ওসব সময় হবে না; গাড়িতে প্যাসেঞ্জার বসে আছে। টাকাও আর নেই হাতে। তুই তো কিছু রেস্ত এনেছিলি মাস্টারটার বাক্স হাতিয়ে—যা কিনে নিয়ে আয়। এখানে আর অত ভদ্দরতাই করতে হবে না। সবাই বাজার করে। আশপাশেই সব পাওয়া যায়। নিয়ে আয়গে ঘরে কুলুপ লাগিয়ে।'

সেই প্রথম বেরোতে হল সুনেত্রাকে।

তারপর থেকে প্রায়ই।

ক্রমশঃ সব বাজারটাই চাপল ওর ঘাড়ে—প্রত্যহ।

ভবেশের এসব করার সময়ও নেই।

রাত্রে ফিরতে বারোটা একটা হয়—খেয়ে শুতে আরও এক ঘণ্টা। দেহের প্রয়োজনটাও অপরের তুলনায় বেশী।

সুতরাং রাত চারটের আগে ঘুমনো সম্ভব হয় না।

ফলে সকালে উঠতে সাড়ে আটটা-নটা বেজে যায়। তাও এক ক্লীনার

এসে ডাকে বলে।

তখন কোনমতে পর পর দুকাপ চা খেয়েই দৌড়তে হয়।

নইলে অপিসের ভীড়টা হাতছাড়া হয়ে যায়।

কোন কোন দিন দুপুরে ফেরে, সেই দিনগুলোতেই স্নান হয়—জল অবশ্য রোজই তুলে রাখতে হয় সুনেত্রাকে—হয়ত খেয়ে এক ঘণ্টা ঘুমিয়েও নেয়।

সেটা নিতান্ত প্রয়োজন।

তখন দোকান বাজারের কথা তোলাই যায় না। আবার উঠেই তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

যাবার সময় কোনদিন তিনটে কোনদিন চারটে টাকা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

রেশন কার্ডের কোন ব্যবস্থা নেই, চাল আটা সব ব্ল্যাকে কিনতে হয়।

এ বাজার করাই এক সমস্যা।

সাধারণ বাজারও যে কখনো করে নি সে বিহ্বল হয়ে পড়বে বৈকি।

প্রথম প্রথম বাইরে বেরোতেই মাথা কাটা যেত। কারণ আশপাশের ঘরে যারা থাকে—বস্তির মতোই পরিবেশ, সেই ধরনেরই ঘর চারদিকে—সেখানে তাদের সঙ্গে ওর চেহারা বেশভূষা একেবারেই বেমানান।

ও কেন এসেছে এ ঘরে, তা ওকে দেখে বুঝতে দেরি হয় না।

এইসব পাড়ার বাসিন্দারা, কি কাছে পিঠে যে সব দোকানদার আছে তারা—সামান্য ছোটছোট মুদির দোকান মনোহারী কি চায়ের দোকান, সবই এ পাড়ার সঙ্গে মানানসই—সকলেই যেন ওদের দুজনের সম্পর্ক সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল; চোখে চোখ পড়লেই অর্থ-পূর্ণ একটা মুচকি হাসি ফুটে ওঠে মুখে, কৌতুক-মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের (কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বা অনুকম্পা) দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বাজারহাট শুরু করার দিন তিনেক কি দিন চারেক পরে—একজন, পাশের এক টিনের ঘরের মিস্ত্রীর বৌ একটি—পরে জেনেছিল সেও

বিয়ে করা বৌ নয়, এমনিই আইবুড়ো মেয়ে বেরিয়ে এসে ঘর করছে—সে তো সোজাসুজিই প্রশ্ন করে ফেলল, বাঁকা হাসি হেসে বাঁকা-গলায় —'তুমি ভাই নতুন নাম লেখালে বুঝি ভবেশবাবুর এই ঘরে? তা ভাল ভাল। ভবেশবাবুর ক'নম্বর হ'লে তুমি তাহলে?...অবিশ্যি তুমিই বা কি করে জানবে! কতগুলি কে কোথায় আছে তা কি ভবেশবাবুরই হিসেব আছে। আর দরকারই বা কি এত হিসেব-নিকেশের। চলে তো যাচ্ছে, অভাবও তো হচ্ছে না।...তা বেশ। ভাল। ছ্যাখো কদিন ঘর করতে পারো। বিজয়াকে তো নাথি খেয়ে এ ঘর ছাড়তে হ'ল। আমি তাই ভাবতিছি যে, বলি কার জন্মে এত ঘর খালি করার তাড়া। আহা, কী দুগ্‌গতি, কোমরের টাটানিতে উঠতে পারে না ছুঁড়ি—উঠে দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা ছিল না, ও কেঠো পায়ের নাথির তো জোর কম নয়—নেহাত জানের ভয়েই কোঁকাতে কোঁকাতে উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে যেতে হল—নইলে এতবড় ভোজালি বার করেছেল, বলেছেল কেটে দুখানা করে ফেলবে। বলে—এসেছেলে কেন, এ পথের যা দস্তুর জানো না, শখ করে এসেছেলে শখ তো মিটিয়ে দিয়েছি—এবার চরে খাওগে। আমার তাড়া আছে, ঘর এখুনি চাই। তা দেখছি এত তাড়ার মতোই মাল। জোটেও তো ছোড়ার! ঐ তো ক্যাঁকলাসের মতো রূপের ছব্বা। কী দেখে ভোলো ভাই তোমরা কে জানে! হরি বলো!'

অবশ্য এক তরফাই বলে গেছে, সুনেত্রার কোন উত্তরের অপেক্ষা করে নি।

বোধহয় দীর্ঘদিন মনের মধ্যে এ বিষটা জমা হয়েছিল, হয়ত একটু একটু করে জমা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরেই।

সুযোগ খুঁজছিল সে বিষ যথাস্থানে ঢেলে দেবারই।

বিষ উদগার শেষ করেই আর একদফা বাঁকা হাসি হেসে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

পাথর হয়ে গিয়েছিল স্নেত্রা।

অসাড় হয়ে গিয়েছিল হাত পা মন।

চোখের সামনে সবটা যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

অনেক কিছুই আশঙ্কা করেছে কদিনে নিজের পরিণাম সম্বন্ধে—কিন্তু এতটা ভাবতে পারে নি।

কিছু কিছু গল্প উপন্যাস পড়েছে, সিনেমা দেখেছে—এইভাবে যারা নিয়ে আসে—তৃষ্ণা মিটে গেলে ফেলে চলে যায়—এরকম একটা কথাও জানা ছিল।

কিন্তু এইভাবে একজনকে দূর করে দিয়ে সদর্পে সেইখানেই আর এক জনকে নিয়ে আসা—এটা কল্পনা করা কঠিন বৈকি!

সে একটা অমানুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ('বেরিয়ে আসা' কথাটা প্রথম যেদিন মনে হয়েছিল, সেদিন হঠাৎ চাবুক খাওয়ার মতোই চমকে শিউরে উঠেছিল। মন 'না' 'না' বলে উঠেছিল সবেগে—কিন্তু তারপরই ভেবে দেখেছে যে, শুনতে যত খারাপই মনে হোক কথাটা, এ ছাড়া আর কোন অভিধায় তার আচরণ অভিহিত করা যায় না।)—এ সত্যটা এই কদিনেই উপলব্ধি করেছে, কাঞ্চন ছেড়ে একটা কাচে গেরো দিয়েছে—দেবতা ছেড়ে একটা পশুকে বেছে নিয়েছে সে।

কিন্তু সে যে পশুও নয়, পিশাচ—এটা জানতে পারে নি।

পা-পা করে চলে ঘরে ফিরে এসেছে স্নেত্রা, অবশ অসাড় পা দুটোকে কোনমতে টেনে নিয়ে।

কি করতে বেরিয়েছিল, কি জিনিস আনতে—তাও আর মনে ছিল না।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকার পর আবার একটু একটু করে সাড় ফিরেছে।

বুঝেছে যে, নিজের সর্বনাশ যখন জেনে বুঝে নিজেই করেছে, তখন এ পরিণাম মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিষ খেলে মরতে হয়—আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে—এ তো সামান্য

একটা বালকও বোঝে !

'জানতাম না' এ কৈফিয়ৎ দেবে সে কাকে।

এমন কি আদালতেও এ যুক্তি অচল—ওর মেসোমশাই একদিন বলেছিলেন ওকে।

এখন যথেষ্ট বয়সে হয়েছে তার, এ কাজের ফলাফল তলিয়ে বোঝবার মতো।

পাশবিক আচরণের লোভেই তো সে এসেছে, নইলে আর কিছুই তো মূলধন ছিল না ভবেশের।

রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ভদ্রতায় সৌজন্যে—সব দিক দিয়েই তো প্রবীর অনেক—অনেকগুণে ভাল।

পশুটাকে যদি হঠাৎ পিশাচ বলে চেনা যায় তো, সে দায় সে কার ঘাড়ে চাপাবে এখন !

স্বখাত-সলিলে ডোবার পর আর আপসোস করে লাভ নেই।

আর, এ নিয়ে ভবেশের সঙ্গে ঝগড়া কি কথা-কাটাকাটি করে সেই ভয়াবহ এবং হয়ত বা অবশ্যম্ভাবী পরিণামটাকে দ্রুত এগিয়ে এনেও না।

এখনই এই মুহূর্তে যদি লাথি খেয়ে এ ঘর ছাড়তে হয়—গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

বেশ্যাবৃত্তিই এ পথের পরিণতি—বিজয়াকে সেই পথই দেখিয়েছে ভবেশ -কিন্তু সেও,কোথায় কী ভাবে শুরু করতে হয়,সে সব আড্ডা কোথায়, কার কাছে গেলে খবর পাওয়া যায়—তাও তো জানে না।

আরও একটু পরে জোর করেই মনকে শান্ত করে।

খেয়ার নৌকো ডুবিয়ে দিয়েই এপারে এসেছে। এখন আর ওপারের কাথা ভেবে লাভ নেই।

তখনও বিকেল যাকে বলে তা হয় নি।

সে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে আভা বলে সেই মিস্ত্রীর বৌটির কাছেই যায়।

অপমান-বোধ অভিমানের অধিকার আর নেই তার, লাজ লজ্জা খুইয়েই তো এসেছে এখানে।

যেচেই আলাপ করে আভার সঙ্গে, বিনত হয়ে।

তার বিনয়ে আভাও নরম হয়। নিজের কথাও খুলে বলে সব।

দেখা গেল আভার স্বভাবে আর যতই দোষ থাক, অযথা লজ্জা কি সংকোচ আছে, এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

সেও বিবাহিতা স্ত্রী নয়—মানে বিবাহিতা বলতে যা বোঝায়।

তার তথাকথিত বর রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। আভা যখন ওকে প্রথম দেখে তখনও সে পাকাপাকি মিস্ত্রী হয় নি, যোগাড়ে হিসেবে পাশের এক ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করছিল।

কিন্তু কি করে কি আয়, বৌ পুষতে পারবে কিনা—এত হিসেব করার অবস্থা ছিল না আভার, সে বয়সও নয়। পাতলা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ চেহারা টানাটানা চোখ দেখে আর রসের কথা শুনেই মজেছিল।

আভাও অবশ্য এই রকম ঘরেরই মেয়ে, ওরই মধ্যে একটু অবস্থা ভাল —এই যা।

তার বাপ ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, কসবায় গোলপাতার ছাউনি মাটির বাড়িও আছে একখানা।

প্রায় তিনমাস ধরে কাজ চলেছিল পাশের মহাদেব পালের বাড়িতে। লোকটা রোজ আসে, ছুতোয়-নাতায় কথা বলার চেষ্টা করে; আলাপ জমে উঠতে দেরি হয় নি।

বিশেষ দুপুরে কোন কাজ থাকত না আভার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ি করা দেখত।

ওর জীবনে এ-অভিজ্ঞতা হয় নি তার আগে। সবেতেই তাই অবাক লাগে।

রাস্তার কল থেকে জল তুলতে হত আভাদের, সেখানে জল খাওয়ার ছুতোয় শ্রীধরও আসত সেই সময়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করে যেত।

আভার ভাল লাগত এই অবসরটুকু। ভাল লাগত শ্রীধরকেও।
একদিন ওর বাবারই নজরে পড়ে যায় এই অনভিপ্রেত অন্তরঙ্গতা। তিনি ব্যাপারটা আঁচ করেই মেয়ের বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগেন, মেয়েকেও শাসন করেন সেই সঙ্গে।
মেয়ে তখন স্পষ্টই বলে দেয় যে সে শ্রীধর ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না, 'অন্যত্তরে' বিয়ে দিতে গেলে আপিং খেয়ে মরবে।
আভারা মাহিষ্য, শ্রীধররা পদ্মরাজ। বাবা এ বিয়েতে মত দেন না, তিনি ওকে ঘা-কতক দিয়ে ওর বড় ভগ্নীপতির কাছে রেখে আসেন বাখড়া-হাটে।
তাকে বলে আসেন শালীকে কড়া পাহারায় রাখতে।
'কিন্তু মেয়েছেলে যদি কোন পুরুষের কাছে পৌছবে মনে করে—তাকে খোদ ভগবানও পাহারা দিয়ে ধরে রাখতে পারে না, কী বলো ভাই?'
আভা সগর্বে বলে, 'দুদিন গেল চারদিন গেল, আমিও তক্কে তক্কে আছি। পোষ মেনেছি মনে করে জামাইবাবু দিদিও ইদিকে একটু নিশ্চিন্তি হয়েছে—একদিন রাতের বেলায় ফাঁকায় যাবো বলে বেইরে বাগানে পড়ে পেছনে এক শ্যাখের উঠোনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া! সটান বড় সড়ক ধরে হেঁটে শেষ রাত্তিরেই পৌছে গেলুম। কেবল মা কালীকে ডেকেছি কোন গুণ্ডা বদমাইশের হাতে না পড়ি—তা সেসব কিছু হয় নি, দুবার সেপাই পুলিস ধরেছেল, তা চোখে নোনা আঙুল দিয়ে কেঁদে বলিছি—আমার বাবার খুব অসুখ, ভাইকে খবর দিতে যাচ্ছি, আর কেউ কিছু বলে নি, ছেড়ে দেছে।'
'তারপর, এখানে ওকে ধরলে কী করে?' সুনেত্রা প্রশ্ন করে।
সে নিজের দুঃখ ভুলে তন্ময় হয়ে শুনছিল এই গ্রাম্য মেয়ের প্রেম-কাহিনী।
'সে আমার হিসেব ঠিক ছেল। জানতুম যে যেখানেই যাক, সকালবেলা ঢাকুর ইস্টিসানে হাজির থাকবেই। ঐখেনে সব মিস্তিরী যোগাড়েরা এক হয়, কে কার সঙ্গে কোথায় কাজে যাবে সব ঠিক করে। দেখা হয়েও গেল

ঠিক। তখুনি চলে গেলুম কালীঘাটে—মালাবদল শেষ করে নিলুম, ও পেসাদী সিঁদুর দিয়ে দিলে মাথায়। ওর হাতে কিছু ছিল না, আমারই দুগাছা করে ব্রোঞ্জের চুড়ি ছেল, তাই বেচে এখেনে এই ঘর ভাড়া করে এসে উঠলুম। সে কী সংসার ভাই বলব, পরনে একখানা কাপড়, গামছা পরে ঘরে বসে তাই শুইকে নিই, হাঁড়িতে ভাতেভাত ফুটিয়ে পাতা পেতে খেতে হয়। না বাসনকোসন, না কিছু। তারপর অবিশ্যি একে একে সবই হয়েছে, বেটের খোকাখুকীও হয়েছে দুটি—অভাব বলতে, প্রিকৃত অভাব যাকে বলে—তা আমার নেই।'

'তা ওঁরা খোঁজ পান নি? তোমার মা বাবা ভগ্নীপতি?'

'ওমা, তা পাবে না? চাপা কথা কতকাল ছাপা থাকে বলো। এসে-ছেল, তড়পে গেছেও প্রেথমটায় খুব—তা তড়পে আর তখন কি করবে বলো? ভোগের আগেই তো উচ্ছিষ্টি হয়ে বসে আছে। এ মেয়ে ফিইরে নে গে কি করবে? আর কেউ বে করবে ত্যাখন? এমনি—বলে নিদাগী মেয়েরই বে হয় না। তা ছাড়া আমিও দমবার বান্দা নই, সোজা বলে দিলুম যে, আমার ঢের বয়েস হয়েছে, নিজে এসেছি কালীঘাটে, বে হয়েছে, পুরুত সাক্ষী আছে—আর কিছু করতে পারবে না, সটান পথ দ্যাখ গে। তা সে তারপর সব মিটমাট হয়ে গেছে, আমিও বাপের বাড়ি গে থেকে এইছি, ওরাও এয়েছে, মা এসে আমার বিয়েন তুলে দে গেছে দুবারই, বোনেরা ভগ্নিপোতরাও আসে। এখন এই জামাইই নাকি সেরা শুনতে পাই।···তা তবে কি জানো—'

গলাটা অকারণেই নামায় আভা, 'এক পক্ষে কথাটা ঠিকই। লোকটা অসুরের মতো খাটে। আমাকে মাথায় করে রেখেছে, গায়ে একটুন্ আঁচ লাগতে দেয় না। আমার কাপড়-চোপড় ছেলে-মেয়ের জামা-পোশাক তো দেখছই—রাজমিস্তিরির বৌ কি কেউ বলবে? নিজে না খেয়েও ওদের ভাল ভাল ফুড যোগায়, মুসুম্বী নেবু নিয়ে আসে, বারণ করলে শোনে না। তা সে মানুষ যদি কোনদিন কাউর সঙ্গে একটু

এদিক ওদিক করে, কি এক আধদিন কারও পাল্লায় পড়ে নেশাভাঙ করে —করে না, আমি এমনি কথার কথা বলছি—তাতে আমি অত দোষ ধরি না, আমার কোন দুঃখু করা উচিতও নয়।—কী বলো ভাই, ঠিক কিনা?'

তারপর একটু থেমে, নিজের ঘরের ভেতরেই একবার সগর্বে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'তবে আমার কথা আলাদা, আমরাও এমন কিছু ভদ্দর-নোক আপিসারের ঘরের মেয়ে নই—কোটা বালাখানাতেও মানুষ হই নি, নিজেদের ভিটে—দুবেলা দুটো শাক-ভাতও খেতে পেয়েছি এই পজ্জন্ত —তার বেশী কিছু নয়। সে হক্কে এমন কিছু খারাপ পাত্তরেও পড়ি নি। খেটে খায়, অন্য মেয়েমানুষও ধরে নি, আর একটা বে'ও করে নি— আমাকে ফেলেও দেবে না। কিন্তু তুমি এ কী করলে ভাই, তোমাকে তো দেখে মনে হয় বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়ে, নেখাপড়াও শিখেছ— চেহারার জেল্লা দেখে বুঝছি বে'র পরেও তেমন কোন অভাবে থাকো নি, মনোকষ্টে থাকলে ও ঢলঢলে রূপ থাকত না,—মনে তো হচ্ছে বাচ্ছাও হয়েছে—তবে সেসব ছেড়ে এই গোঁয়ার পিচেশটার সঙ্গে এলে কোন্ দুঃখে? বলে, মারবার না নোক থাকলে চাল্‌তে-তলায় বাস—তা তুমিও কি মার খাবার নোভে বেইরে এয়েছ? যেখেনে ছেলে সেখানে ডুবে মরার মতো একটা পচা ডোবাও ছেল না?'

ক্রমে ক্রমে আভার কাছ থেকে আরও অনেক খবরই পায় সুনেত্রা। যে খবর আগেই নেওয়া উচিত ছিল ওর।

ভবেশের বাবার আর্থিক অবস্থা নাকি খারাপ ছিল না।

এমনি টিনের বাড়ি মাটকোঠা, তবে আরও ছিল, ধাপার দিকে খানিকটা জমিও ছিল নাকি।

ওর মায়ের হাতও একেবারে খালি নয়।

মধ্যে কি গোলমালে পড়েছিল ভবেশ, কোন উকিলের মেয়ের সঙ্গে কি চালাকি করতে গিয়েছে, সে সোজা পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছিল।

ভবেশ তো তেরিয়া, বলেছিল 'কি করতে পারে দেখি, না হয় দু'চার দিন হাজতেই থাকব। তারপর ও শালা এ মেয়ের বে দেবে কেমন করে? আদালতে গেলে কি কেচ্ছা-কেলেঙ্কার কিছু চাপা থাকবে?'

কিন্তু ওর মা অত নিশ্চিন্ত হতে পারেনি—খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে উকিলকে এক হাজার টাকা নগদ গুনে দিয়ে মিটিয়ে নেয়।

আভার বর শ্রীধরকে কাজের খাতিরে এদিকের সব পাড়াতেই যাতা-য়াত করতে হয়, সে ভবেশের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানে।

সুনেত্রার খবরও জেনে আসতে তার বেশী দিন লাগবে না—আভা এও শুনিয়ে দেয়।

'এটা ওর একটা রোগও—'হেসে বলে আভা, লোকের খবর নেওয়া—কে কি করছে, কোথায় কি হচ্ছে। এ-ই ওর সিনেমা ব্যাপারের কাজ করে।

বাপ মরতে একে একে সেইসব জমি বাড়ি বেচে সমস্ত টাকাই নাকি এই মেয়েমানুষের পেছনে উড়িয়েছে ভবেশ।

এমনিও গাঁজা মদ সবই চলে সময়েসময়ে—কিন্তু মেয়েছেলের নেশাটাই প্রবল।

বসতবাড়িটা বেচতে পারে নি, তার কারণ ওটা মার নামে কেনা, তা ছাড়া সবই বেচে দিয়েছে।

তবু কী ভাগ্যি হাতে প্রথম টাকা পড়তেই গাড়িটা কিনে নিয়েছিল, আর এটা এখনও বেচে খায় নি।

তবে বাঁধাটাধা দিয়েছে কিনা তা আভা বলতে পারবে না।

এরকম তথাকথিত স্ত্রী নাকি সর্বদাই তিনটে-চারটে করে থাকে ভবেশের।

কেউ যাদবপুরে, কেউ বেহালায়, কেউ হয়তো সোরগুনোয়।

একটা করে মাটির কি টিনের ঘর ভাড়া করে এনে তোলে, কিছু দিন পোষে, তারপর গা ঢাকা দেয়।

মধ্যে মধ্যে অনেকদিন পর পর হয়ত এক আধবার গিয়ে পড়ে,—তখনও যদি সে মেয়েটা দেখে ঘর কামড়ে পড়ে আছে তো দু পাঁচ টাকা দেয়, সে টাকা উশুল করে নিয়েই আবার সরে পড়ে।

সে কি খাচ্ছে, কোথা থেকে কীভাবে যে খাওয়া জুটছে সে খবর নেয় না কখনও।

আর যদি দেখে যে সে নিজের পথ দেখেছে তো নিশ্চিন্তি, আর সেমুখো হয় না।

ইদানীং—বোধহয় কোন কারণে ঠিক-মতো বেরোচ্ছে না বলে হাতে টাকা পয়সা কম, নতুন ঘর ভাড়া করে আসবাব সাজাবার মতো পয়সা নেই—তাই এমনিভাবে তার এই ঘর খালি করানোর খুব দরকার হয়ে পড়েছিল।

'তিনচার দিন আগে এসে বিজয়াকে বলে গেছল ঘর ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু সে হঠাৎ কোথায় যায়? ঝিগিরি করে খেতে গেলেও তো একটু মাথা গোঁজার জায়গা লাগে। বলেছেল, আমাকে তাড়িও না, আমি তোমার পয়সা চাই না—ভিক্ষে করে খাবো কি উপোস করব, শুধু পড়ে থাকতে দাও। এমন ভাবে হাতে কিছু নেই, মাথার ওপর কোন লোক নেই, আমাকে কে ঘর দেবে? তাকে কুচ্ছিত ভাষায় গালমন্দ করেছে। বলেছে, 'তুই খানকি, নইলে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসবি কেন? তোর যা কাজ তাই করগে যা, খানকিগিরি করবি, পয়সার অভাব কি? একটা কারখানার দোরের সামনে ছুটির সময় গিয়ে দাঁড়াগে যা, যে হয় ধরে নিয়ে যাবে। মোদ্দা, ঘর আমার খালি চাই।'···তুমি যেদিন আসো তার আগের দিন এসে বলে, 'এখ্খুনি, এই দণ্ডে বেইরে যা, আমি কোন কথা শুনতে চাইনি। বিজয়া তবু কি বলতে গেছল, তা সে সব শোনবার ওর সময় কোথা? ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে নাথি কষিয়ে বার করে দিলে,

তারপর দোরে কুলুপ লাগিয়ে চলে গেল। তখুনি বুঝলুম নতুন কেউ আসছে। ঠিক তাই, পরদিনই দেখলুম তোমাকে এনে পুরলে খাটালে।'

আবারও সেই অসাড় হয়ে যাওয়া ভাবটা বোধ করে সুনেত্রা।

বুকটা সুদ্ধ যেন পাথর হয়ে যায়।

মাথা নীচু করেই বসে শুনছিল, অনেক পরে অনেক কষ্টে প্রশ্ন করে, 'তা সেই বিজয়া এখন কোথায়?'

'কোথায় আবার। তখন তো ঐ অবস্থা, উঠতে পারছে না—আমি পেরায় কোলে করে আমার ঘরে নিয়ে এলুম। বকিও খুব খানিকটা যা মুখে আসে; বলি, যেমন পিরবিত্তি তেমনি উচিত শাস্তি হয়েছে—আবার মন-কেমনও করে, কেরাসিন তেল ঘষে মালিশ করে কাঠ কয়লার আঁচে কাপড় গরম করে সেঁক দিই। নইলে দেখি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। কী ভাগ্যি সেদিন তোমার বোনাই হঠাৎ দুপুরে খেতে এসে পড়েছিল, সে সব শুনে বলে, রসো আমি দেখছি।

'এই দিকে কাছেই যোধপুর পার্কে এক বুড়োবুড়ি একা থাকে, মস্ত বড় বাড়ি, অগুনতি ভাড়াটে—তাই মিস্তিরীর কাজ লেগেই থাকে, ইনি আবার তো তারে-বাড়া, নিজেকে বলে রাজমিস্তিরীর ওপর আমি হচ্ছি ওস্তাদ মিস্তিরী—মানে রঙের কাজ চুনের কাজ থেকে এস্তক মোজেক পাথর-ঘষা পজ্জন্ত সব তো শিখে নিয়েছে—ওকে পেরায়ই ডাকতে হয়। খুব ভালও বাসে বিশ্বাসী বলে, ওকে ছাড়া কাউকে ডাকে না, বলে কাকে বাড়ির মধ্যে এনে ঢোকাব, চোর ছ্যাচড় হবে কী হবে, সুলুক-সন্ধান সব জেনে গিয়ে রাত দুপুরে গলায় ছুরিই বসাবে হয়ত এসে।

'তা তাদেরই গিয়ে ধরে পড়তে—এ সব বিত্তান্ত কি আর বলেছে তা নয়, বলেছে বরটা নেশা ভাঙ করে কোথায় উধাও হয়েছে কমাস, বাড়ি-আলারা অনেকদিনের ভাড়া পায় নি, আদালতের নোক এনে বার করে দিয়েছে, মালপত্তর সব কোরোক্ করে নিয়েছে, ভদ্দরলোকের মেয়েটা এক বস্তরে পথে এসে দাঁইড়েছে, বাপের বাড়িতেও তেমন কেউ নেই,

আর ভাবসাবের বে তো, কোন আপ্তস্বজন মুখ দেখে না। এখন আপনারা যদি একটু আচ্ছ্রয় দেন—ঝিয়ের কাজ, রাঁধুনীর কাজ যা বলো সব করবে। তা তারা এক কথায় রাজী, বলে অজানা মানুষকে আজকাল ঘরে ঠাঁই দেওয়া ঠিক নয়, বিশেষ অল্পবইসী মেয়ে—তা তুমি যেকালে বলছ ছিধর—এই গ্যাখো ভাই নাম করে ফেললুম—তখন থাক। কিছু ভাবতে হবে না, কাজকর্ম করা লাগবে না, মেয়ের মতোই থাক।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'একটা পাখি পুষলেও তার ওপর মায়া হয়, ঐ মেয়েমানুষটাকে বার করে এনেছে আজ দুবছর—একটা বাচ্ছাও পেটে এয়েছেল, তা একটু কোলে পেতে কি নাড়াঘাঁটা করতে দিলে না, কোথা থেকে কি করিয়ে খসিয়ে নে এল। সেটা থাকলেও তার মুখ চেয়ে বুক বাঁধতে পারত—একুল ওকুল দুকুল ঘুচিয়ে বসে রইল আবাগী—তা এক মোত্তরের জন্যে একটু মায়াদয়া হল না, এমন পিচেশ! হাত্তোর মানুষ রে! আমাদের এর একটু করে পাদোক জল দুবেলা খেলে যদি মানুষ হয়। নইলে দুটো হাত দুটো পা থাকলেই কি মানুষ!'

পতিগর্বে আভা সোজা হয়ে বসে বুকে একটা চাপড় মারে।

'তা সে—মানে বিজয়া কি করবে এখন?'

কথাগুলো যেন গলায় আটকে আটকে যায় সুনেত্রার।

অনেকটাই আন্দাজে বুঝতে হয় আভাকে।

'কী আর করবে। বুড়োবুড়ীর তো খুব মনে ধরেছে, এমন যত্ন-সেবা নাকি ওদের কেউ কখনও করে নি। বেটা বৌ এই কলকেতার মধ্যেই আছে—কখনও উদ্দিশ নেয় না; ওদের তো পছন্দ হবেই, বেঁচে গেছে বলতে গেলে। তবে এভাবে তো কাটবে না। ওরা আর কদিন! একটা মলেই আর একটাকে বাধ্য হয়ে ঐ বোয়ের কাছে গিয়ে উঠতে হবে। না হলেও—আরও অক্ষ্যাম হয়ে পড়লে? যদি ধরো আজকাল কী বলে এষ্টোরোক না কি—তাই যদি হয়? তখন তো ব্যাটার কাছে যেতেই হবে।...বিজয় খুঁজছে—ওরই মধ্যে একটু ভাল চাকরিবাকরি

পায় কিনা। পেত, বুড়োই করে দিত, একটা পাস করা মেয়ে নাকি—তা সে কাগজপত্তর তো বাপের বাড়ি, সে কে আনতে যাবে বলো! জানাজানি হলেও কেলেঙ্কার—বুড়োবুড়ীর এ আচ্ছ্রয়টুকুও যাবে তখন। ঐ কাজের কাজী জানলে কি আর ওর হাতের জল খাবে ভেবেছ? ওধারে বাপও নাকি বলে রেখেছে, কখনও সন্ধান পেলে কেটে দু টুক্‌রো করে ফেলবে—তাতে ফাঁসি যেতে হয় সেও ভি আচ্ছা!

…'চাকরি, অন্য রকম কিছু দেখতে হবে।' আভা একটু চুপ ক'রে থেকে কথার সূত্র ধরে আবার, 'খুঁজছে খুব আমাদের ইনিও, গুণধর বলি আমি, ছিধর নাম—যদি ভাল বাড়িতে ওরই মধ্যে একটু ওপর তলার কাজকর্ম পাওয়া যায় কিনা, মানে ছেলে-রাখা কি ভাঁড়ার দেওয়া—বড়লোকের বাড়ি থাকে তো এমন ধারা—নইলে রান্নার কাজও করতে রাজী ও, কিন্তু ঐ বয়েস, চেহারাও দিব্যি—কে দেবে রান্নার কাজ বলো? পেলেও শতেক ক্ষোয়ার—। আমি তো দেখেছি, আমার বাপের বাড়ির পাড়ায়—এমনি একটা কচি মেয়ে এয়েছেল, কত্তা কত্তার বেটা দুজনে ধরে টানাটানি, মায় বাড়ির গুর্খা চাকরটা পজ্জন্ত। বাচ্ছা মেয়ে একটা ছেল, তার জন্যেই আরও অত ফৈজৎ সয়ে পড়েছেল, শেষে আর থাকতে পারলে না; মেয়ের হাত ধরে পালিয়ে এসে আমাদের বাড়ি ছেল পাঁচ দিন!…আর কি জানো, আপিসের কাজে পেমোশন হয়—এখেনে ঢুকবে রাঁধনী হয়ে—শেষে বয়েস গেলে ঝিয়ের কাজ করতে হবে।'

নিজের ভবিষ্যতের চেহারাটাও কি এর মধ্যে দেখতে পায় না সুনেত্রা? আর বসে না সে, বসতে পারে না।

মাথার মধ্যে কেমন করে।

এ কদিনই মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, বোধহয় পাগল হয়ে যাবে এবার। কিছু যেন মাথাতে ঢোকে না, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়—কী ভাবছে তারই যেন খেই ধরতে পারে না খানিক পরে।

কখনও মনে হয় পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার থেকে বাস ট্রামের

তলায় গলা দেওয়া ভাল।

তাই দেবে নাকি ?

সব জ্বালা থেকে অব্যাহতি !

সেই দিন রাত্রে ভরসা করে কথাটা তুলেছিল ভবেশের কাছে।

বলেছিল, 'এ ঘরে যে থাকত তার নাম, সব কথা আমি শুনেছি। তা অমন করে লাথি মেরে তাড়ালে কেন! তোমার তো আরও এমন অনেক আছে শুনলুম, আমাকেও অন্য কোথাও তুললে পারতে !'

একেবারে তেড়ে উঠল ভবেশ, 'ছ্যাখ, ঐ সব ফ্যাচ-ফ্যাচানি করতে আসিস নি আমার কাছে বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না! তার দু বছর পরে যা হয়েছে তার নমুনা আজই দেখিয়ে দোব! আমি কি করেছি না করেছি, কী করছি সে আমি বুঝব। কারুক্কে কৈফেৎ দেবার বান্দা আমি নই। ....তুই কি ভেবেছিলি, তোর জন্যে এতকাল সোঁদা বসেছিলুম, না তোকে নিয়েই জীবন কাটাব! সে রকম যদি পছন্দ তো তাকে ছেড়ে এলি কেন! আমি যদি তেমন সাধুপুরুষ হতুম তাহলে এ কাজ করব কেন, তুইই বা আসবি কেন!···নে, চুপ কর। দিনরাত ওসব ব্যাগর ব্যাগর আমার কাছে চলবে না, নাকেকান্নাও না। যদি দেখিছি কোনদিন ফোঁস ফোঁস করছিস, মায়া কান্না—এক ঘুষিতে নাক ফাটিয়ে চোখ কানা করে দোব। আমার কাজের সমালোচনা! তুই কি করিছিস, অমন ভদ্দর স্বামী ছেড়ে ছেলে ছেড়ে আসিস নি ?'

এর পর আর একটি কথাও বলা যায় না।

সে সময়ও থাকে না।

ঐ ইতর পশুটার সর্বগ্রাসী লালসা তাকে এ আঘাত সামলাবার অবসর দেবে—সে আশা করাও ভুল।

মেয়েদের দেহটাই সে বোঝে—মন, চিন্তা, ভালবাসা, রুচি অরুচি—

এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার।

বেশ্যাদেরও বোধহয় এর থেকে স্বাধীনতা আছে—কে জানে!

প্রবীর একদিন বলেছিল, বাইবেলে নাকি একটা কথা আছে, 'পাপের বেতন মৃত্যু।'

ভুল কথা, মৃত্যু তো সমস্ত কষ্টের সমাপ্তি, শান্তি।

তার আগে বহু মূল্য দিতে হয় মানুষকে, বহু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

হয়ত, সেইটেই আসল মৃত্যু, এই দিনে দিনে যন্ত্রণা ভোগ করা।

সেই মৃত্যুর কথাই হয়ত বাইবেলে বলতে চেয়েছে।

৮

একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করে সুনেত্রা, নির্লজ্জতাও।

শ্রীধরকে দিয়েই প্রবীরের নতুন বাসার ঠিকানা সংগ্রহ করে।

একদিন দুপুরে খোঁজ করে করে যায়ও—দূর থেকে একবার ছেলেটাকে দেখবে বলে।

দেখা হয় না। সম্ভবত সে ঘুমোচ্ছে তখন ঠাকুমার কাছে।

সে সম্ভাবনা জেনেই গিয়েছিল অবশ্য।

দৈবের ওপর ভরসা করে।

ছেলের কাছাকাছি যেতে পেরেছিল, তাতেই যেন শান্তি।

তারপর থেকে শ্রীধরের মারফতই খবর পায়।

শাশুড়ি মারা গেলেন। হঠাৎ তিন দিনের জ্বরেই শেষ হয়ে গেল।

মনটা অনেকদিন ধরেই ভেঙেছিল ছেলেদের দুর্ব্যবহারে, সুতরাং দেহটাও ভাঙতে বাধ্য, ভেতরে ভেতরে ঘুণধরা হয়ে গিয়েছিল।

প্রবীরের বিয়ের পর, বিশেষ নাতি হতে সংসারে খানিকটা আসক্তি ফিরে এসেছিল, সবল হয়ে উঠেছিলেন।

এই কেলেঙ্কারীর পর একেবারেই আবার ভেঙে পড়লেন বোধ হয়।

ফলে সামান্য জ্বরেই হৃৎপিণ্ড অনড় হয়ে গেল, যোঝবার চেষ্টাও করল না একটু।

এর অর্থ—এই নিঃশব্দ মৃত্যুর—আগে হয়ত এমনভাবে বুঝত না, এখন বোঝে।

আরও বোঝে।

এ ঘটনার সুদূর প্রসারী ফলাফল ও অনুমান করতে পারে সে।
প্রবীর অসহায় হয়ে পড়ল।
সম্পূর্ণভাবেই।
তাছাড়াও, মার এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্যও হয়ত নিজেকে দায়ী করছে সে।
আর তার গ্লানি যে কত দুঃসহ—নিজের চরম ক্ষতির দুঃখর সঙ্গে অপরের অন্যায় ও পাপের বোঝা বওয়া—হয়ত সুনেত্রাও আজ কতকটা বুঝতে পারে।
কী করে বাঁচবে, কী করে বাঁচছে—প্রতিদিন এই দুঃখ অপমান ও লজ্জার সঙ্গে যুদ্ধ করে—সেইটেই তো ভেবে পাওয়া যায় না।
তার চেয়েও বড় কথা ছেলেটা।
তাকে নিয়েই তো সব চেয়ে আতান্তর।
কে দেখবে তাকে, কে সামলাবে প্রবীর যখন ইস্কুলে যাবে?
বাড়িতে অন্য ভাড়াটে আছে বটে কিন্তু এই দেড় বছরের ছেলে সামলাবার কী গরজ তাদের?
ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য আছে কিনা তাই বা কে জানে?
অথচ প্রবীরের বাইরে না বেরোলে তো ভাতভিক্ষাই বন্ধ হয়ে যাবে।
হায়রে। এ কথাটাও যদি আগে বুঝত!
এমনভাবে না হয়, যদি কিছুও বুঝত।—

এখন এই ভাবনাটাই পেয়ে বসে সুনেত্রাকে।
প্রবীরের আর খোকার ভাবনা।
যেন ওদের জীবনযাত্রার প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় কল্পনায়।
বিব্রত প্রবীর হয়ত এখন অপটু হাতে খোকাকে চান করাচ্ছে, এই হয়ত দুধ খাওয়াতে বসল। (দুধ এখানে কেমন পাচ্ছে কে জানে!),

এই হয়ত ঘুম পাড়াচ্ছে, হয়ত কাঁথা বদলাল এখন—এমনি সব ছোট-খাটো দৈনন্দিন অবশ্যকরণীয় কাজের ছবি দেখে সে মনে মনে, বায়স্কোপের ছবির মতো।

এই ব্যথাতুর অথচ সুখদ ভাবনাটা একটা বর্মের মতো তাকে ঘিরে রাখে বলেই ভবেশের সাহচর্যের অপমান ও দৈহিক দুঃখ যেন তাকে আর আঘাত করতে পারে না।

এর মধ্যে এক আধদিন নেশা করে এসে মারধোরও করেছে, রুক্ষ ব্যবহার তো অঙ্গের ভূষণ—কিন্তু তার কোনটাই যেন আর গায়ে বাজে না।

এ দুর্ব্যবহার যার সঙ্গে করা হচ্ছে সে যেন অন্য লোক কেউ, তার সঙ্গে সুনেত্রার মানস জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

ইতিমধ্যেই কিছু কিছু অনুপস্থিতি শুরু হয়ে গিয়েছিল ভবেশের।

মাঝে মাঝেই দু'তিনদিন করে ডুব মারত—এইসব রাতগুলোতে স্বস্তির সীমা থাকত না।

রান্না খাওয়াও করতো না—শুধুই বসে বসে কল্পনার জাল বুনে যেত প্রবীর আর খোকনকে কেন্দ্র করে।

আভা এইসব দিনগুলোতে যেন ওর উপবাসের গন্ধ পায়, রাতে না হোক, দিনে যখন হোক এসে কিছু খাইয়ে দিয়ে যায় জোর করে—কিংবা সত্যিসত্যিই হাত ধরে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়।

আভাই বলে, 'এতদিন ধরে এক জায়গায় শেকড় গাড়া এর আগে ওর হয় নি, এর মধ্যেই তো অরুচি হয়ে যাবার কথা। তবু তোর ওপর তো টান আছে দেখছি। এ যে, এই দু' তিন দিন অপর জায়গায় যাওয়া—এ কিছু নয়, পুরনো ঘরগুলো বজায় দিতে যাওয়া। কিংবা কোন নেশা কি জুয়ার আড্ডায় গিয়ে পড়ে, দু'তিন দিন আর নড়তে পারে না। না, তোর রঙটা এখনও আছে ওর মনে। উল্টোটাই তো শুনেছি, ঝিগিরি রাঁধুনীগিরি করে কিংবা কুরুশ বুনে কি উল বুনে পেটে খেয়েও সেই ঘর কামড়ে পড়ে থাকে নাকি—মানিকচাঁদ কখন গিয়ে দুটো নাথি-

ঝ্যাটা মেরে কিতাথ্থ করবেন, মাসে ছ মাসে হয়ত ঐ ছুদিন একদিন !'

বলতে বলতেই কিন্তু ভুরু কুঁচকে অদ্ভুত এক ধরনের ধূর্ত দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে চায়—চেয়েই থাকে।

শেষের কথাগুলো কতকটা যন্ত্রের মতো বলে যায়, যেন আর কী ভাবছে।

তারপর বলে, 'তার মানে কি জানিস—অন্তত আমার যা মনে হয়, পুরোপুরি এখনও তোকে বশ করতে পারে নি, আর সেটা ও বুঝেছে। একেবারে পায়ে ধরাতে না পারলে ওর শান্তি হবে না, অরুচিও আসবে না। সেই জন্যেই এখনও বেয়ে চেয়ে দেখছে, এ যে ওর হার মানার ব্যাপার, এ অব্‌দি তো কারুর কাছে হার মানে নি—সে নিজের কাছেই লজ্জার ব্যাপার হবে কিনা !'

কে জানে, ভবেশকে নিয়ে অত মাথা ঘামাতে চায় না সুনেত্রা।

তার রুচি অরুচিতে, মনের রঙ থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না আর।

কোন কিছুতেই যেন এসে যায় না।

ভবেশ কবে এল বা না এল, কদিন আসে নি—তাও অত তার খেয়াল থাকে না।

বেঁচে থাকা না থাকা ছুইই সমান হয়ে গেছে এই জীবনেই ওর।

এর মধ্যে সুনেত্রার আবার একবার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছিল বৈকি !

টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কী একটা ওষুধ এনে দিয়েছিল ভবেশ, সেও বিনা দ্বিধায় তা খেয়ে নিয়েছিল।

কিসের ওষুধ তা জিজ্ঞাসা করে নি।

তবে আঁচ করতে পেরেছিল।

তারও ঐ কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল তার একটা পিশাচ রাক্ষসের জন্ম দেবে !

তার চেয়ে সে সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট হওয়া ভাল।

ফলে তিন চার দিন উঠে দাঁড়াবার উপায় ছিল না।

আভা একবারও ওকে বাইরে না দেখতে পেয়ে অসুখ আঁচ করেই খবর নিতে এসেছিল, এখন এক নজর ওর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল।

ঘরের মেঝেতে যেন রক্তের সরোবর হয়ে গেছে, তার মধ্যে মড়ার মতো, নির্জীব হয়ে পড়ে আছে সুনেত্রা। ভবেশের কোন পাত্তা নেই।

আভা তার স্বভাবমতো খানিকটা বকাঝকা করল, গালমন্দ দিল, আবার শুশ্রূষাতেও লেগে গেল।

ঘর-দোর সাফ করে ওকে নাইয়ে ধুইয়ে, সাবু করে খাইয়ে, পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মদন নাগের কাছে থেকে এক পুরিয়া ওষুধও এনে দিল।

বলল, 'ঐ খুনে বজ্জাতটার হাত থেকে এই ওষুধ খেলি—ভয় হল না একটু? যদি মরে যেতিস? কী খাওয়াচ্ছে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

'আমার আবার মরবার ভয়।'

ক্ষীণকণ্ঠে ক্ষীণতম হাসির ভঙ্গী করে বলে উঠল সুনেত্রা, 'তুমি হাসালে আভাদি। এত সহজে আমার মৃত্যু হবে! তা হলে আর ভাবনা ছিল না। ল্যাঠা তো তা হলে চুকেই গেল। এতখানি পাপ এতখানি বেই-মানীর শোধ উঠবে তাহলে কি করে! আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনে বলতে গেলে মাথায় করে রেখেছিল, তার বুকে ছুরি মেরে চলে এসেছি, নিজের পেটের ছেলের কথাটা পর্যন্ত ভাবি নি—এ মহাপাতুকীকে মৃত্যু দেবেন ভগবান!…না আভাদি, আমি জানি আমি মরব না, মরার বিষ দেয় নি ও—শুধু শরীরটা হয়ত একটু ভাঙবে। সেও তো ভাল, মরার দিকেই তো এগিয়ে যাওয়া ভাই। অবিশ্যি মরতেও আমি চাই না, এ জন্মেই এ পাপের ক্ষ্যায় করে যেতে চাই—আসছে জন্ম অবদি যেন এর কিছু বয়ে নিয়ে যেতে না হয়। গেল জন্মে বোধ হয় নির্জনে বসে যত পাপ ছিল সব করেছি, কেউ বাধা দেয় নি বারণ করে নি—এ জন্মে তাই এই অবস্থা। সাজানো সংসার, দেবতার মতো বর, ফুলের মতো

ছেলে—ভোগে এল না বললে কিছু বলা হয় না—নিজের হাতেই সে ভোগ করার পথ ঘুচিয়ে দিয়ে এলুম। এবার দুজন্মের প্রাচিত্তির একসঙ্গে করে যাব।'

ওর কথায় আভার চোখে জল এসে যায়, সে মুখ ফিরিয়ে যেতে যেতে বলে, 'মরণ তোমার! জ্ঞেয়ান পাপী। এত বুদ্ধি এত হিসেব সেদিন কোথায় ছিল!'

আরও কিছু দিন ভেবে আর ছটফট করে এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসে সুনেত্রা।

প্রথমে—কল্পনাতেই ভয় হয়েছিল—চমকে উঠেছিল কথাটা মনে হতেই —কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ভাব দমন করে।

যে মরেই গেছে তার আর ভয়ই বা কি লজ্জাই কি!

তবু, যদিই এটা সফল হয়—জীবনে একটা আশ্বাস থাকবে, একটুখানি সান্ত্বনা।···

আজকাল সকালে বেরিয়ে গেলে কোন দিনই প্রায় দুপুরে খেতে আসে না ভবেশ, দৈবাৎ কোনদিন এদিকে সওয়ারী জুটে না গেলে নয়।

অবশ্য তার কোন নিশ্চয়তা নেই, এসেও পড়তে পারে—তবে তা-ও অত কেয়ার করে না আর সুনেত্রা।

কী আর করবে, বাড়িতে না পেলে না হয় গালমন্দ চেঁচামেচি করবে খানিকটা, মুখ খারাপ খিস্তি-খেঁউড় করবে—রাত্রে ফিরে মারধোর করবে।

করুক, সে আর গ্রাহ্য করে না।

শারীরিক আঘাতও তাকে আর বেদনা দেয় না। বরং সেটাকে প্রায়শ্চিত্ত মনে করে একরকম তৃপ্তি বোধ করে।

এর ভেতর কৌশলে, আভা না বুঝতে পারে এমনভাবেই, বিজয়ার ঠিকানাটা যোগাড় করেছে সে, মোটামুটি সে পাড়াটা কোন্‌দিকে তাও

খোঁজ ক'রে জেনে নিয়েছে।

একদিন ভবেশ চা খেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোরে তালা দিয়ে সেও বেরিয়ে পড়ল যোধপুর পার্কের দিকে।

এভাবে যে যেতে পারে সে, যাওয়া সম্ভব, কিছুদিন আগেও তা ধারণার বাইরে ছিল।

কিন্তু আজ সেটাই সহজ ও স্বাভাবিক মনে হ'ল।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে বাড়ি খুঁজে বার করা কঠিন নয়---কিন্তু তারপর ?

অসুবিধা ঢের।

যে মেয়েছেলে বাড়িতে বাড়ির মেয়ের মতো আছে, সে কেন বাইরে আসবে !

ছেলে-পুলেও নেই---যতদূর শুনেছে—যে, তাদের সামলাতে বা ইস্কুলে এগিয়ে দিতে বাইরে আসতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল ওকে ; একবার যেন দেখলও,—দোতলার বারান্দায়, বোধহয় কী রোদে দেওয়া ছিল, উল্‌টে দিয়ে গেল। সুশ্রী চেহাবার অল্পবয়সী মেয়ে এ বাড়িতে বিজয়া ছাড়া আর কে হবে ? শ্রীধরের কাছে শোনাই ছিল যে দোতলার সামনের দিকটা নিয়েই বুড়োবুড়ী থাকেন, সুতরাং এ-ই হবে নিশ্চয়—কিন্তু তাকে ডাকবে কি করে ?

চোখোচোখি হলেও ইশারা করা যেত।

নাম ধরে ডাকলে বাড়িতে কে শুনতে পাবে, নানান জবাবদিহি—বিজয়াও হয়ত অবাক হয়ে ওপর থেকেই নানা প্রশ্ন করবে—কে কী বৃত্তান্ত, কি দরকার—সে একটা হৈ-চৈ। কী জবাব দেবে তখন ?

এদিকে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না।

এর ভেতরেই বহু কৌতূহলী চোখ সোৎসাহে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, দু'একজন অকারণেই কাছে এসে দাঁড়ায়।

অগত্যা সেদিনকার মতো চলে আসতে হল।

তাই বলে হালও ছাড়ল না।

এত সহজ কাজ হবে—তা সে আশাও করে নি।

কোনমতে একটা দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ক'রে—পর পর গেলে আশ-পাশের লোকের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠবে, কথাটা বুড়ো কর্তার কানে ওঠাও বিচিত্র নয়—দ্বিতীয় দিনে আবার গেল।

সেদিন আর বিফল হল না, দেরিও হল না দেখা পেতে।

ঠিক সেই সময়ই বিজয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোশক রোদে দিচ্ছিল, হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকাতেই সুনেত্রার চোখে চোখ পড়ল।

অপরিচিত একটি তরুণী মেয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে দেখে একটু অবাক হয়েই ভাল ক'রে চেয়ে দেখল।

সেই সুযোগে দুই চাপা ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে গোপনতার সংকেত জানিয়ে ওকে ইশারায় নিচে ডাকল সুনেত্রা।

বিস্মিত হল বিজয়া, বিরক্তও হল।

আসলে ভয়ও পেল সে, চোখে মুখে তার ত্রাস নয়—আতঙ্কের চিহ্নই ফুটে উঠল দেখতে দেখতে।

ভয় কেন, তা সুনেত্রা বুঝল।

এটুকু বোঝার মতো অভিজ্ঞতা তার হয়েছে।

আভাই তার গুরু—জীবনের বহু সত্য তাকে শিখিয়েছে। সে বহু তথ্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

কলুষিত অতীতের কোন সাক্ষী ভয় দেখাতে এসেছে কিনা, জীবনের দুষ্টগ্রহ এখানের এই আশ্রয়টুকুও নষ্ট করতে চায় কিনা—এই ভয়েই বিবর্ণ হয়ে উঠেছে বিজয়া।

দেখে দয়া হয় বৈকি। নিজেকে দিয়েই ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে যে!

সমবেদনা জাগাই তো স্বাভাবিক!

কিন্তু দয়া দেখিয়ে ফিরে গেলে হবে না।

ওর উপকারের জন্যেই কঠিন হতে হবে।

সে যতদূর সম্ভব আশ্বাস দেবার ভঙ্গী করে ইশারাতেই জানাল যে সে একটি মিনিট মাত্র ওর সঙ্গে কথা কইতে চায়।

ব্যাকুল বিপন্নভাবে বিজয়া এদিক ওদিক চাইল একবার।

মিনতিভরা চোখে সুনেত্রার দিকেও তাকাল কিন্তু দেখল সেদিক থেকে কোন দয়া মায়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে তেমনি স্থির এবং বহু লোকের সকৌতূহল লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অগত্যা বিজয়াকে নেমে আসতে হয়।

পাশের তিনফুট সংকীর্ণ গলিতে এসে দাঁড়িয়ে সেইখানেই ডাকে ওকে, কাছে আসতে বলে, 'কী ব্যাপার বলুন তো। আমাকে আপনার কী দরকার? আমি তো ঠিক আপনাকে চিনি না, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন!'

গলা কাঁপছে বিজয়ার।

ঝড়ের মতোই প্রশ্নগুলো করে গেল—মরীয়ার মতো।

সুনেত্রা বুঝল তার অবস্থা।

সেও দ্রুতই কথা সারল।

বলল, 'ভয় নেই ভাই। তোমাকে ভয় দেখাতে কি কোন অনিষ্ট করতে আসি নি। ব্যথার ব্যথী হিসেবেই এসেছি। একই ভাগ্য আমাদের। যে ঘর থেকে তোমাকে বার করে দিয়েছে ঐ লোকটা, সে ঘরে আমিই এসে ঢুকেছি। সব শুনেছি, আভাদি সব বলেছে—শ্রীধর মিস্ত্রীর বৌ। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা, কিন্তু সে এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে হবে না।···তুমি এখানে একটা কিছু মিথ্যে সম্পর্ক খাড়া করতে পারবে না? বাপের বাড়ির পাড়ায় থাকতুম কি ইস্কুলে পড়তুম একসঙ্গে? কী কী বলতে হবে বলে দিও—যাতে দুরকম কথা না হয়ে যায়—আমিও সেই ভাবেই বলব। একটু নির্জনে বসে দুটো কথা কওয়া দরকার।

লক্ষ্মীটি, তুমি অন্য কিছু ভেবো না। একটু ব্যবস্থা করো যেমন ভাবেই হোক। বলো তো একদিন দুপুরে আসি, বলবে বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে ডেকেছি—চেনা লোক অনেক দিন পরে দেখা। মানে ওঁরা ঘুম থেকে উঠলে—। দুপুরে একটু ঘুমোন তো ওঁরা?'

সংশয় আর আশঙ্কা এত সহজে যায় না, বরং বেড়েই যায়।

এত দ্রুত কথাগুলো বলে যায় সুনেত্রা যে সব কথা ঠিক ধরতেও পারে না, তাতেই আরও সন্দেহ বাড়ে।

অজানা আকারহীন আশঙ্কায় বুক কাঁপে।

বিজয়া হাত জোড় করে বলে, 'কেন ভাই আমাকে এমন করে বিপদে ফেলছেন, আমি তো আপনার কোন অনিষ্ট করি নি। এ আশ্রয়টুকু যদি যায়, রেলে মাথা দেওয়া কি গঙ্গায় ডুবে মরা ছাড়া কোন পথ থাকবে না।'

সুনেত্রা ওর হাত দুটো সেই অবস্থাতেই চেপে ধরে।

বলে, 'যে দিব্যি আমাকে গালতে বলবে গালছি—মা কালীর দিব্যি, আমার নিজের মা-বাবার দিব্যি, খোকনের দিব্যি—আমি কোন অনিষ্ট করতে আসি নি। নিজের সর্বনাশ তো করেইছি—সে জন্যে তোমাকে সুদ্ধ কত লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে সেই শুনেই আমার লজ্জার সীমা নেই। আমি তোমার একটা ভাল আশ্রয়ের ব্যবস্থাই করতে চাই, তুমি বিশ্বাস করো।'

খানিকটা যেন স্বস্তি পায় বিজয়া।

ওর বলার ভঙ্গীতে, গলার আওয়াজে কিছুটা বিশ্বাসও হয় কথাগুলো। সেও এবার দ্রুত বলে, 'আমি এখন যাই ভাই, আপনি বরং কাল দুপুরে আসুন একবার। দুটো থেকে চারটে- -এই সময়টা নিশ্চিন্ত, দুজনেই ঘুমোন ওঁরা। আমি ছাদে বসে অনেক সময় ডাল মসলা বাছি, বিছানা-মাদুরে রোদ খাওয়াই—কেউ থাকে না তখন, সেখানেই বসে কথা হতে পারবে।'

সুনেত্রা আর কথা বাড়ায় না।

সময়ও নেই।

তারও এখন দ্রুত সরে পড়া উচিত।

এই অবস্থায় এভাবে দাঁড়িয়ে একটা অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে কৌতূহল স্বাভাবিক।

অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল ও বক্র সন্দেহ।

তা থেকে নানারকম জবাবদিহির সৃষ্টি!

অজ্ঞাতকুলশীল যুবতী মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মনে নানারকম আশঙ্কাও থাকবে।

কে জানে কার সঙ্গে কী ষড় করছে, চোর ডাকাতের সঙ্গে সাজস আছে কিনা—আগেই এইটে মনে হবে!

তা ছাড়াও আজকাল নানারকমের বিপদ দেখা দিচ্ছে নাগরিক জীবনে—সুতরাং জবাবদিহিটা যদি একটু উগ্র ও কুটিল পথ ধরে তো বলার কিছু নেইও।

সে বিজয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, 'জানোই তো ভাই, ওর ওটাই আসবার সময়। তবে সব দিন আসে না—এই একটা বাঁচোয়া। তুমি ঠিক ছুটোর সময় একটু নজর রেখো, কাল যদি না আসতে পারি—পরশু ঠিক আসব। তুমি দেখে ডেকে নিও।'

৯

একে একে বিজয়ার সম্পূর্ণ ইতিহাসটাই জানা যায়।

ধীরে ধীরে বিশ্বাস আর আস্থা অর্জন করে সুনেত্রা।

বাড়ির কর্তা ও গিন্নির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বিজয়া।

সুনেত্রার পরামর্শ মতোই দিয়েছে।

ছোটবেলার বন্ধু, স্কুলের সহপাঠিনী—বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ভয়ে-ভয়েই ডেকে নাম জিজ্ঞেস করেছে।

সুনেত্রাও মুখটা চেনাচেনা লাগতেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাতেই আরও ভরসা করে ডাকতে পেরেছিল বিজয়া—তারপরে পরিচয় বেরিয়ে গেছে।

খুব একটা দূরেও থাকে না, এ পথে যাতায়াতও করতে হয়। অবস্থা ভাল নয় স্বামীর, তাই সেলাইয়ের কাজ করে বেড়ায়, এ পাড়া ওপাড়া ঘুরতে হয়—এই কথাই বুঝিয়েছে বিজয়া কর্তাগিন্নীকে।

তাঁরাও সন্দেহের কোন কারণ দেখেন নি।

সহজ ভাবে সাধারণ প্রশ্ন করেছেন, সুনেত্রাও সুকৌশলে তার জবাব দিয়েছে।

কী জবাব দিতে হবে তা আড়ালে বিজয়ার সঙ্গে বসে মিলিয়ে নিয়ে মুখস্থ করেছে—অর্থাৎ মনে রেখেছে।

ভবিষ্যতে না দু'রকম হয়ে কিছু মিথ্যা বেরিয়ে পড়ে।

সন্দেহ হওয়ার কোন কারণও ঘটতে দেয় নি ওরা।

সুনেত্রা যেদিন আসে সকাল করেই আসে—বেলা একটা দেড়টানাগাদ।

তখন ওঁদের খাওয়া-দাওয়া চুকে যায়, ঘুমোতে যাওয়ার আগে বসে পান খেতে খেতে ছুটো খোশগল্প করার সময় সেটা (বেশির ভাগই বর্তমান কালের বৌদের অসহ্য আচরণের আলোচনা)।

প্রতিদিন ঘুমোবার পর এসে আবার ঘুম থেকে ওঠার আগে চলে গেলে একটু সন্দেহ হতে পারত।

সে সংশয়ের অবকাশ রাখে নি।

যে প্রকাশ্যেই আসে, তাঁদের সঙ্গেও বসে গল্প করে—তার ওপর অবিশ্বাস আসবে কেন ?

আর তাই ঘুম ভেঙে ওঠার আগে চলে গেলেও কোন প্রশ্ন জাগে না মনে।

সব দিন তাও যায় না।

চারটের চা তৈরী করে বিজয়া ডাকে ওঁদের, সেই সঙ্গে সুনেত্রাও চা খেয়ে 'তবে আসি মাসিমা' বলে উঠে পড়ে।

পর পর নিয়ম করে আসেও না।

কোনবার ছুদিন কোনবার চার পাঁচ দিন পরে আসে।

গিন্নীর তো খুবই স্নেহের চোখে পড়ে গেছে, তিনি এর মধ্যেই 'তুমি' থেকে 'তুই'তে নেমেছেন এবং খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনেকবার।

সে নিমন্ত্রণ একদিন নিতেও হয়েছে ওকে।

সুতরাং নিভৃত আলাপে কোন বাধা হয় নি কোথাও।

বিজয়ার বাবা মধ্যবিত্ত কেরাণী, খুব হতদরিদ্র অবস্থার লোকও নন।

অনেকগুলি পোষ্য বলেই, বড় একান্নবর্তী পরিবার—বিলাসব্যসনে বিশেষ খরচ করতে পারেন না, তেমন বাড়তি টাকা নেই।

তাঁর প্রথম বয়সেই বিধবা দিদি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি এসে উঠেছিলেন, তাঁরাও এই পরিবার-ভুক্ত হয়ে গেছেন।

ছুই ভাগ্নে উপার্জন করছে, বিয়েও করেছে—তবু সবাই এই বাড়িতেই থাকে।

এ ছাড়া বিজয়ার এক বিধবা কাকী আছেন তাঁরও ছেলেমেয়ে পাঁচ-ছটি। কাকা ক্যান্সার রোগে মারা গেছেন, কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, সে সংসারও বিজয়ার বাবার ঘাড়ে।

খুড়তুতো বোনেরা বড়, তাদের দুজনের বিয়েও দিতে হয়েছে বিজয়ার বাবাকেই।

অবশ্য তাই বলে যে মেয়েকে লেখাপড়া শেখান নি কি উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়েছেন—তাও না।

খাটতে হয়েছে সংসারে ঠিকই কিন্তু সে সকলের সঙ্গেই।

যেখানে সকলে মিলে কাজ করে, সেখানে খাটুনি গায়ে লাগে না।

বিজয়ারও লাগে নি।

সে হিসেবে সুখেই ছিল সে।

জীবনযাত্রার সহজ উপকরণের অভাব ছিল না।

অভাব যেটা ছিল—শখ-শৌখিনতা ফুর্তি করার মতো বেহিসেবী বাড়তি টাকাব।

আরও একটা অভাব ছিল।

সেটা হচ্ছে আশু বিবাহসম্ভাবনার। সংসারের যা অবস্থা—দৈবের যোগাযোগ ছাড়া তাড়াতাড়ি বিয়ে হবার কোন আশা ছিল না।

অথচ বহু বিবাহিতা, নব-বিবাহিতা ও সদ্য-বিবাহিতা মেয়েদের সহচর্যের ফলে অতি অল্পবয়সেই নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রায় তাবৎ তথ্য জানা হয়ে গিয়েছিল—সে জ্ঞান মনকে অহরহ অভিজ্ঞতার জন্য ব্যস্ত ও উৎসুক করে তুলত, তার কৌতূহল স্থির থাকতে দিত না।

এমনি সময়ে একদিন ভবেশ এসে পড়ল ওর জীবনে।

হঠাৎই।

বিজয়াদের বাড়ির সামনে যাদবের গ্যাবেজ বা কারখানা।

সেখানে মধ্যে মধ্যে গাড়ি সারাতে আসে ভবেশ।

হয়ত অনেকদিন ধরেই আসছে, অত লক্ষ্য করে নি বিজয়াকে।

লক্ষ্যে পড়ল সে-ই এক দিন। ওর জীবনে মহা কুগ্রহের দিন সেটা।

ভবেশ দেখল ও বেশ হিসেব করে একদিন দেখা দিল!

ওর ঐ বখা বাউণ্ডুলে চোয়াড়ে চেহারার মধ্যে কী দেখেছিল বিজয়া, তা সে নিজেও জানে না।

আজও, অনেক ভেবেও, বুঝতে পারে না।

হয়ত ওর মধ্যেকার নির্মম পাশবিকতাটাই আকর্ষণ করেছিল, কে জানে।

তবু হয়ত যোগাযোগ সহজ হত না।

কিন্তু কোন সম্ভাব্য ভোগ্যের সন্ধান পেলে তাকে আয়ত্ত করতে ভবেশের দেরি লাগে না।

সে শীগ্‌গীরই একটা উপায় ভেবে বার করল অতি অনায়াসে।

কী করে তা কেউ জানে না, দু'চার দিনের মধ্যেই সে বিজয়ার পিসতুতো ভাই সুবাসের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল এবং 'পাস' বলে তাকে সিনেমার টিকিট কিনে দিয়ে ও সিগারেটের খরচা যুগিয়ে তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

সেই সুবাদে বাড়িতেও আসা যাওয়া শুরু হল।

তারপর অন্য দু'চার জন ভাই-বোনের সঙ্গে ট্যাক্সী করে ঘোরাতে বেরুনো আর এমন কি দুঃসাধ্য?

এরই ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা দামী প্রসাধন দ্রব্যও এসে পড়া কিছু আশ্চর্য নয়।

বিজয়া তো ওর দিকে আকৃষ্ট হয়েই ছিল—ক্রমশ উৎসুক, তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল।

পতঙ্গ যেখানে পুড়ে মরতেই ব্যগ্র, সেখানে আগুনের আর কতক্ষণ লাগে তার মৃত্যুর পিপাসা মেটাতে?

সেক্ষেত্রে আগুনের দোষ দেওয়াও চলে না বিশেষ।

বিজয়াও দেয় না।

এমন কি সে অদৃষ্টেরও দোষ দেয় না।

এ তার স্বখাত সলিল।

একেবারে নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ না বোঝার মতো সরল নয় সে—নাবালিকা তো নয়ই।

সে জেনে বুঝেই তো সব ছেড়ে—বাপ মার স্নেহের কোল, নিরাপদ আশ্রয়, হয়ত বা সুদূর ভবিষ্যতে কোন উজ্জ্বল জীবন, সুখের সংসার লাভের সম্ভাবনা—সমস্ত ত্যাগ করে একটা অশিক্ষিত বর্বরের দ্বারা নির্যাতিত নিষ্পিষ্ট হবার লোভেই চলে এসেছিল।

না, দোষ কারও নয়।

দোষ শুধু তার কাপুরুষতার।

সে মরতে পারে নি—এই অমানুষিক দুর্গতির পরও।

সেই কাপুরুষতাকেই ধিক্কার দেয় সে—এর পরেও তার বেঁচে থাকার স্পৃহাকে।

এ ছাড়া সে কাকেও দোষী বা দায়ী করতে চায় না।

একদিনে কি এক নিশ্বাসে নয়—একটু একটু করেই এই ইতিহাসটা জানতে হয় সুনেত্রাকে।

সব তথ্যসুদ্ধই জানে সে, সে জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে।

নিজের এই শ্রেণীর কলঙ্কের, নির্বুদ্ধিতার কথা—সর্বনাশের এই রকম শোচনীয় ইতিহাস যে সহজে কোন মেয়ের পক্ষে মুখ ফুটে খুলে বলা সম্ভব নয়—তা নিজে মেয়ে হয়ে সে বোঝে বৈকি।

তাই তাড়া দেয় না, অসহিষ্ণু হয় না।

নিজের সমবেদনায় ও সহানুভূতির উত্তাপে অপমান আর লজ্জাবোধের কাঠিন্য গলিয়ে নেয়—বরফ গলে নির্ঝরিণীর রূপ ধারণ করে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বলে নিজের কথাও।

অকারণ সংকোচ করে না।

যেখানে দুজনেই সমান, একই নির্বুদ্ধিতার পথিক—সেখানে লজ্জা বা সংকোচ করবেই বা কেন?

সব শোনা শেষ হলে একদিন সুনেত্রা প্রশ্ন করে, 'তারপর? কী করবি ঠিক করেছিস? জীবনটার কি গতি হবে?'

অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে বিজয়া।

'গতি! এরপর আর গতির কি আছে ভাই! একেবারে চরম ছাড়া? যে কদিন এখানে আশ্রয় থাকে এখানেই থাকব। তারপর এমনি ভাল কোন জায়গায় কাজ পাই ভাল, নইলে—মা গঙ্গা তো আছেনই শেষ পর্যন্ত। শুনেছি সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে নেয় কোন্ কোম্পানি—তা সে কে-ই বা ব্যবস্থা করছে আর কোথায় থেকেই বা শিখব। এঁরা ছাড়বেন না। গেলে একেবারে যেতে হবে।...না ভাই, মরা আর ঝিগিরি—এ ছাড়া কোন পথ নেই। তবে নিজের ওপর আর অত বিশ্বাসও নেই। মরতে যদি সাহস না হয় এরপরও—যা চরম দুর্গতির পথ—সেই দিকেই যেতে হবে হয়তো!...বিধাতা কতটা যে লিখেছেন অদৃষ্টে তা তো জানি না!' বলতে বলতেই দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ওর।

'ও মা, ছি!' সুনেত্রা নিজের আঁচল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দেয়, বলে, 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।...শোন, আমি বলি কি—তুই একটা বিয়ে কর!'

বিজয়া অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

তার দৃষ্টি যেন একটু বেদনাহত হয়ে ওঠে।

এটাকে আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা বলে মনে হয় ওর।

খানিকটা চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'তুমি কি তামাশা করছ দিদি?'

ততক্ষণে সুনেত্রাও তার ভুল বুঝেছে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'না ভাই, তামাশা নয়। সত্যিই বলছি। মনের মধ্যে একটা কোন উপায় না ভেবে কি কথাটা বলেছি। ...আর, তা ছাড়া, সে আগের দিনকালও নেই। অসহায় বিধবা বললেও বিয়ে হয়ে যাবে। একটা কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, যদি কেউ উদ্যোগী হয়ে

দাঁড়ায়—ভাল বিয়ে হওয়াও আশ্চর্য নয়। অমন ঢের ছেলে আছে, এগিয়ে আসবে, ভাল ছেলে। না দেখেই আসবে। দেখলে তো কথাই নেই, তোর যা চেহারা, দেখার পর কোন খোঁজ-খবরও করবে না। তবে তারও দরকার নেই, একটা ভাল পাত্তরেরই সন্ধান আছে, সেই ভেবেই কথাটা তুলেছি!'

এই পর্যন্ত বলে—বলতে গিয়েও থেমে যায় একটু।

এতদিন ধরে ভেবে রাখা কথাটা, মনে-মনে বহুবার মহড়া দেওয়া—কী ভাবে বলবে, কেমন করে কথাটা পাড়বে—তবু শেষ মুহূর্তে যেন রাজ্যের সংকোচ এসে কণ্ঠরোধ করে, বক্তব্য গুলিয়ে দেয়।

শেষে, মিনিট দুই চুপ করে বসে থাকার পর যেন জোর করেই বলে, 'আমি বলছি—মানে আমাদের এঁর কথা। মানুষটা খুবই ভাল। ভাল বললেও কিছু বলা হয় না, দেবতা। আগে বুঝি নি, কাছে থাকতে—আজ বুঝছি। না চাইতে, না ভাবতেই পেয়ে গেছলুম বলে দাম বুঝি নি। টাকা দিয়ে রোজগারের পরিমাণ দিয়ে মাপতে গেছলুম সাধারণ কেরানী মজুরের হিসেবে। টাকাও অবশ্য কম রোজগার করেন না—করতেন না অন্ততঃ আমার আমলে। আমার জন্যেই খাটতেন ভূতের মতো—আমাকে সুখে রাখবেন বলে। আমি আবাগীর সেটাও সহ্য হল না, আমি চাইতুম টাকাও রোজগার করুক আবার আমার দরকার মতো হাজরে দিক আমার দরবারে—ছেলের ঝক্কি পোয়াক, আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাক।...সে যে সম্ভব নয়, তাও সেদিন বুঝি নি, বোকার মতো খিটিমিটি বাধিয়েছি। তার মধ্যেই একদিন এই লোকটা এল—এই নরকের পোকাটা।...প্রথম থেকেই যে পায়েস খায় তার বোধ হয় তাতে অরুচি ধরে, সে চায় ছ্যাচড়া আর টক। আমারও তাই হল, স্বেচ্ছাসুখে স্বর্গ ছেড়ে নরকের দিকে পা বাড়ালুম।'

শেষের কথাগুলো আর পরিষ্কার বলা যায় না, কান্নায় গলা বুজে আসে সুনেত্রার।

তবু বিজয়া যখন আকুলভাবে কিছু বলতে যায়—হাতের ইঙ্গিতে ওকে নিরস্ত করে আবারও বলতে শুরু করে, 'তাও কি তাঁর কথাই এত বেশী ভাবছি। যা ভাবছি আমার স্বার্থের কথাই।···ছেলেটার অশেষ দুর্গতি হচ্ছে। মা যত দিন ছিলেন, তবু এক রকম। কিন্তু পর পর এতগুলো আঘাত সহ্য হল না তাঁর। বড় জায়ের কাছ থেকে মার খেয়েই অর্ধেক পরমায়ু শেষ হয়ে গিয়েছিল—বাকীটুকু আমিই শেষ করলুম। তিনি শেষ পর্যন্তও—মরে মরেও দেখতেন, তিনি গত হওয়াতেই আরও পথের ধারের ভিখিরীদের ছেলের মতো মানুষ হচ্ছে। কাজ কামাই ক'রে তো আর ছেলেকে নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে না—পুরনো তেমন বিশ্বাসী ঝি থাকলেও কথা ছিল, নতুন কোন ঝিকে সব ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই এর ওর তার কাছে, যে দয়া করে ভার নিতে রাজী হয়, তার কাছেই রেখে যেতে হয়। দাম্বেলে ছেলে, তায় এখন হাঁটতে শিখেছে, তাকে সামলানোও কঠিন। কার এত দায় পড়েছে যে দিনরাত খাড়া পাহারায় থাকবে, না ঘুমিয়ে পা-খেয়ে চোখে চোখে রাখবে!'

এই পর্যন্ত বলে আবার একটু থামে, হয়ত দম নিতে, হয়ত কথার খেই খুঁজে পেতে—তারপর বলে, 'আমি খবর সব রাখি ভাই, আভার মানুষ প্রত্যেকটি খবর এনে দেয়, সেদিন নাকি বেরিয়ে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, চব্বিশ নম্বর বাসের রাস্তা। গাড়ি-চাপাই পড়ত, নেহাত গুরুবল তাই—উনি আজকাল ওর জন্যেই আরও টিউশ্যনী ছেড়ে দিয়েছেন, বিকেলেই ফিরে আসেন—পথে আসতে আসতে চোখে পড়ে গিয়েছিল—নইলে কী সব্বনাশ হ'ত কে জানে—কথাটা মনে হলেও গা শিউরে ওঠে, বুক কাঁপে।···এখানে যে নিজেরই কোন আশ্রয়ের ঠিক নেই, তেমন যদি হত, কিছুটা মানুষের চামড়া থাকত ঐ দত্যিটার—তা হলে ছেলেকে চুরি করে নিয়ে চলে আসতুম। সে পথও যে নেই।'

দু তিন মুহূর্ত দম নিয়ে আবার বলে, 'সেই জন্যেই আমার এত মাথা-কোটাকুটি, তুই যদি যাস, সে লোকটাও সময়ে একটু সেবা, একটু ভাত

জল পায়, ছেলেটাও মানুষ না হোক, কোনমতে বড় হতে পারে।… আর মানুষই বা হবে না কেন, তা নয়—তবে এমনভাবে ঐ বস্তির পাঁচ জনের দয়ার ওপর ভরসা করে, হয়ত বা পাঁচটা হাভাতে বখা ছেলেদের সঙ্গে পড়ে থাকলে জানোয়ারই তৈরী হবে—নইলে যদি ওর আওতায় থাকতে পায়, মানুষের মতো মানুষই হবে।'

বলতে বলতে সুনেত্রা যেন কোথায় কোন্ সুদূরে চলে যায়

অন্যমনস্ক, দৃষ্টি দূরনিবদ্ধ।

গলায় আওয়াজটাও যেন কতটা আত্মস্থ, স্বগতোক্তির মতো শোনায়।

যেন নিজেকেই বোঝাচ্ছে কথাগুলো, স্বপ্ন দেখছে অনেকদিন পরের কোন্ এক ভবিষ্যতের।

বিজয়া সেই যা প্রথম ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিল, তার পরই স্থির।

নিশ্চল হয়েই শুনেছে কথাগুলো।

দোজবরে স্বামী, উপরন্তু একটি সতীনপো থাকবে।

কিছুদিন আগে হলেও হয়ত এ প্রস্তাব তার অসহনীয় মনে হত, এখন লোভনীয় বোধহয়।

এতই অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত রকমের লোভনীয় যে, তার জীবনে এ দিন আর কখনও আসা সম্ভব বলে ভাবতেও পারে না, স্বপ্ন দেখতেও সাহসে কুলোয় না।

একেবারেই আষাঢ়ে গল্প এ তার কাছে—বামনের চাঁদ ধরার মতো।

আকাশকুসুম।

এমন জীবন—সুখের না হোক, বিলাসবহুল না হোক, সম্মানের, মর্যাদার জীবন—তার এই দেহে, এই পরমায়ুতে কোন দিনই আসবে না, আসতে পারে না।

এসব কথা ভাবাও তার পক্ষে পাগলামি। হয়ত বা অপরাধও।

সেই কথাই বলে বিজয়া।

খানিকটা নীরবে মাথা হেঁট করে বসে আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে

কাটতে কেমন একরকমের গাঢ়, ধরা গলায় বলে, 'এসব কথা আলোচনা করে কি লাভ ভাই? শুধু শুধু মন খারাপ করা, কষ্ট পাওয়া বই তো নয়। তোমারই মন খারাপ বেশী হবে আমার আর কি? মিছিমিছি এতটা আশা গড়ে তোলা মনের মধ্যে, যা হবে না, হওয়া সম্ভব নয়—তারই সন্ধান দেখা।' সুনেত্রা ওর হাত দুটো চেপে ধরে।

বলে, 'যদি আমি সম্ভব করতে পারি? চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? ক্ষতি তো কিছু নেই! তুই যা আছিস তাই থাকবি না হয়। বড় জোর সে বলবে "না"। তোর তো তাতে বেশী কোন লোকসানের ভয় নেই!'

'কী বলছ দিদি! যাঃ। তাই কখনও হয়।' অবিশ্বাস ও সংশয় যেতে চায় না বিজয়ার কণ্ঠ থেকে, 'না, না, এ কাজ করতে যেয়ো না। যদি জানাজানি হয়—সে এক মহা-কেলেঙ্কারি। তখন তো অপমান হয়ে ঝাঁটা লাথি খেয়ে বেরোতে হবে।'

'ত্যাখ, উনিই বলেন, অনেকবার বলতে শুনেছি, ইংরেজীতে একটা কথা আছে—ঝুঁকি না নিলে কোন লাভও হয় না। ঝাঁটা-লাথি মারার লোক সে নয়—যদি তাড়িয়েও দেয় একটা কোন ভাল ব্যবস্থা করেই নেবে। তুই রাজী হ ভাই, আমি আর পারছি না। শুধু যে ছেলের জন্যেই এমন করছি তাও নয়—সত্যিই বলছি, বিশ্বাস কর, এ মুখে কথাটা আনাও হয়ত অন্যায়---ঐ মানুষটার জন্যেও কষ্ট কম নয় আমার। ওঁর যা ক্ষতি করেছি, যা অনিষ্ট করলুম, তার শোধ জীবনভর আমাকে দিয়ে যেতে হবে, লাঞ্ছনা আর দুর্গতিতে—তাতেও শেষ হবে না সে পাপের, কিন্তু ঐ দেবতার মতো লোকটার এই ছন্নছাড়া জীবন, এই কষ্ট মনে হলে ইচ্ছে হয় নিজের হাতে নিজের গলা টিপে দিই!'

কথা শেষ করার আগেই ঝরঝর করে দুই চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে। ওর সেই অসহায় আকুল কান্না দেখে বিজয়া আর 'না' বলতে পারে না। তারও দুই দৃষ্টি বাষ্পাকুল হয়ে এসেছে তখন—কথা বলার শক্তিও নেই।

১০

শ্রীধব মিস্ত্রীকেই চেপে ধরল সুনেত্রা।

লোকটা খারাপ নয়, একটু তোষামোদ চায় শুধু।

এ ক্ষেত্রে সেটুকুবও প্রয়োজন হল না, কিছুটা কৌতুক আব কিছুটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে সে নিজেই উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সে ওস্তাদ 'বাক্-চতুব' অর্থাৎ 'কইয়ে-বইয়ে'—কোথায় কেমন কবে কথা পাড়তে হয় তাতে কতটুকু মিথ্যাব খাদ দবকাব, কতটুকু পবনিন্দাব বসান ও উপস্থিত ব্যক্তিব ব্যজস্তুতিব পালিশ—তা সে ভাল বকমই জানে।

বস্তুতঃ এই ক'রেই খায় সে। তবু সে শান্তভাবেই সুনেত্রাব কথাগুলো শুনল, বিশেষ যার কাছে যাচ্ছে—সে প্রবীব মানুষটা কেমন, কী ধাঁচেব—তাও জেনে নিল।

তাবপব একদিন একটা সুবিধামতো দিন দেখে 'দুর্গা' বলে বওনা দিল।

গহনা টাকা যা সঙ্গে এনেছিল সুনেত্রা তাব মধ্যে এক ছড়া হাবের খবব ভবেশ জানত না—লুকিয়ে এনে লুকিযেই রেখেছিল, এক ভবি এগাবো আনাব হাব, কার্য সিদ্ধি হলে সেটাই শ্রীধরকে দেবে—সুনেত্রা প্রতিশ্রুতি দিল।

শ্রীধব গিয়ে বিনীতভাবে নমস্কাব কবে দাঁড়াতে প্রবীব একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই চাইল, কী প্রয়োজন সে জিজ্ঞাসাটা চাহনিতেই ফুটে উঠল।

'আজ্ঞে বাবু—আমি একটা সৎ কাজেই এসেছি, তবে হয়ত আপনি তত তুষ্ট হবেন না। মানে এটাকে আমাব আস্পর্দা বলে ভাবতে পারেন হয়ত। তবে আমার নিবেদন, ভিক্ষাই বলতে পাবেন—একটু ধৈর্য ধরে

আমার কথাটা শেষ অবধি শুনুন দয়া করে।'

তবু সন্দেহ কাটে না, বরং এই ভূমিকাতে তা বেড়েই যায়।

প্রবীর তেমনি ভুরু কুঁচকেই প্রশ্ন করে 'কী ব্যাপার বলুন তো। আমার সময় কম।'

'এই দেখুন, ছি ছি। আমাকে যদি এমন ভাবে "আপনি-আজ্ঞে" করেন আমার মহাপাতুক হবে যে। না, না, 'তুমি' বলুন, 'তুমি'। তুই-তোকারি করলে আরও তুষ্টু হতুম, সেটা অনেক আদরের, অনেক জোরের ডাকও। তবে সে এখুনি পারবেন না। দু চার দিন আসাযাওয়া করলে, আমাকে চিনলে তবে হয়ত—।'

তারপরই প্রবীরের ললাটে বজ্র-গর্ভ মেঘের ছায়া লক্ষ্য করে নিজেই ঘুরিয়ে নেয় কথাটা চট করে, 'না বাবু, এই শ্রীধর মিস্ত্রিরির সব ভাল —কেবল কথার গন্ধ পেলেই আর হস্বি-দীঘ্ঘী জ্ঞান থাকে না, বকতে পেলে হয় একবার। যত ভাবি আর বাজে কথা বলব না, ততই—। হ্যাঁ তা যা বলছিলুম, বাবু, একটি অল্পবইসী মেয়ে ভদ্দর ঘরের, আপনাদেরই জাতের—লেখাপড়াও যে একেবারে শেখেনি তা নয়—কিন্তু কেউ কোথাই নেই, একেবারে নিরাশ্রয়, এক ভদ্দর লোক আশ্রয় দিয়েছেন বটে আমাদের পাড়ায়, মেয়ের মতোই থাকে, কিন্তু তারা বুড়ো বুড়ী, একজন চোখ বুজলেই আর একজনকে বিদেশে কোন ছেলের কাছে তাঁদের চলে যেতে হবে—তখন আবার নিরাচ্ছুয় যাকে বলে। ভিক্ষে কিংবা ঝি-গিরি—তাই বা ঐ বয়সের মেয়ে, রূপ তো নয় আগুনের খাপরা, কে ভরসা করে চাকরি দেবে বলুন তো। ভারী ভাল মেয়ে বাবু। একটা দিন যদি কাছে রেখে দেখেন—ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, এমন মেয়েটা বাদে ছরকটে চলে যাবে নষ্ট হয়ে—বড্ড কষ্ট হয় বাবু মনে করলে। আমার বৌকে ভারী ভালবাসে, তাতেই দেখেছি।...তাই বলছিলুম, ছোট ছেলে-পিলে বড্ড ভালবাসে—আপনারও তো দরকার—বলছিলুম যদি পায়ে ঠাঁই দেন--'

কথা শেষ করতে দেয় না প্রবীর, কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'আমার যে লোক দরকার, আমি যে আবার বিয়ে করতে পারি—এসব হাঁড়ির খবর কে আপনাকে দিয়েছে বলুন তো। আমার কি দরকার না দরকার সে আমি বুঝব, আমার কথা নিয়ে এত আলোচনা হয়, কি কেউ দয়া করে আমার উপকার করতে আসে—এ আমি চাই না।'

কিন্তু প্রবীর যতই কড়া কথা বলুক, শ্রীধরকে তখনও চেনে নি সে, শ্রীধর তাতে না।

বরং সে যেন ভেতরে কোমর বেঁধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়।

কণ্ঠস্বর আরও কোমল, ভঙ্গীটা আরও বিগলিত হবার মতো করে বলে, 'বাবু আমার অপরাধ নেবেন না—দু চারটে যদি সত্যি কথা বলি—অসন্তুষ্টও হবেন না—কিন্তু আপনার হাঁড়ির খবর যাকে বলছেন—তা এ পাড়া কেন, এই ট্যাংরা, বেলেঘাটা, শুঁড়ো, নারকেলডাঙা কোথায় না জানতে বাকী আছে। সবাই জেনেছে বাবু। দিনকতক এ নিয়ে গুলতোন্‌ও ঢের হয়েছে—এখন সব চুপ হয়ে গেছে আবার, এতে আর তেমন রস নেই বলে। খবরও সবাই সব রাখে বাবু, আমাদের মা-ঠাকরুন গত হবার পর থেকে ছেলেটার যে হাড়ির হাল হচ্ছে, কেউ দেখবার লোক নেই, চোখে চোখে রাখা তো দূরের কথা—এ সবই আমরা শুনেছি। মধ্যে একদিন গাড়ি চাপা পড়ার জো হয়েছিল—এও।...এমন ফুলের মতো বাচ্চা, তাই আরও মনটার মধ্যে কেমন করে। আর সেই কারণেই আরও আসা। আপনি দুষ্য ভাববেন না কিছু, মজা দেখতে আসি নি।...তাও তো বলছি, আপনার উপকারের চেয়ে সে আবাগীর উপকার হবে ঢের বেশী। বাবু, একটা জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

জীবন অমন অনেকেরই অনেক ভাবে নষ্ট হচ্ছে, কে কটা তার খবর রাখছে! আর তা ছাড়া সকলের সব দায়িত্ব তো আমার নয়, সকলের জীবন রক্ষেও করতে পারব না। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়েও লাভ নেই।' বেশ একটু রূঢ় ভাবেই জবাব দেয় প্রবীর।

'আজ্ঞে বাবু, আপনারও তো দরকার। মনে করুন না একটা ঝি-ই রাখছেন।'

'ঝি রাখবার হলে আগেই রাখতুম। তা যখন রাখি নি তখন বুঝতে হবে হয় আমার রাখার সংগতি নেই, নয়ত ইচ্ছে নেই।…আচ্ছা, আপনি এখন আসুন।'

'উঁহু, উঁহু বাবু, তা হবে না। আমি এখন আসছি ঠিকই, এখন আর মেজাজ চড়িয়ে দিতে চাই না। তবে একেবারে এখুনি না বলবেন না, জোড় হাত করছি। এই প্রেথম শুনলেন কথাটা, হয়ত একটু চমকেও উঠেছেন, খারাপও লেগেছে। তবে কথাটা একটু উলটে পালটে ভেবে দেখুন—এখনই উড়িয়ে দেবার দরকার কি? দুটো দিন যাক, আমি আবার আসব। আবারও তাড়িয়ে দেন—দুটো দিন পরে ফের আসব। আপনি আমার গুরুজনের মতো—আপনি দুটো গালমন্দ দিলেও আমার ক্ষেতি যাবে না। আচ্ছা বাবু পেন্নাম হই। আসি এখন!'

এই আকস্মিক উৎপাতে, আর যা তার একান্ত ব্যক্তিগত দুঃখের কথা তা এমনভাবে পাড়ায় পাড়ায় আলোচিত হচ্ছে, এই সংবাদে—প্রবীর যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত পাড়া শুধু নয় এই শহর থেকেই চলে যাবে কি না—শ্রীধরের ঐ বিরামবিহীন বাগ্‌জালের মধ্যেই সে কথাটাও একবার উঁকি মেরেছিল মনে কিন্তু তাতেই বা কতটা সমস্যার সমাধান হবে ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকে এক করুণ দৃশ্য মনে পড়ল।

করুণও বটে, সেই সঙ্গে—অথবা সেই কারণেই—বিরক্তিকরও বটে। এ বিরক্তি বা ক্ষোভ নিজের ভাগ্যের ওপর, অদৃষ্টের অকারণ বিরোধিতায়। দেখল, খোকা অশোক কখন কোথায় গিয়ে খুব জল ঘেঁটেছে, ইজের আর জামা দুই-ই সপসপ করছে ভিজে, সেই অবস্থাতেই মেঝের ওপর

শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দেখে উৎকণ্ঠায়, দুঃখে, নিজের এবং ছেলের প্রতি করুণায়—সর্বোপরি একটা অসহনীয় প্রতিকারহীন বিরক্তিতে তার যেন চোখে জল এসে গেল।

কি করবে, এই মুহূর্তে এখনই কি করা উচিত—তাও যেন কিছুক্ষণ ভেবে পেল না, বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে দেখল, গা গরম, জ্বর এসেছে।

হয়ত বা জ্বরের তাড়শেই বালতিতে ঠাণ্ডা জলের সন্ধান পেয়ে নিজে গিয়ে সেই জল মেখেছে।...

জ্বর নিশ্চয় সকালেও তত ছিল না, তা হলে জামা বদলানোর বা দুধ খাওয়াবার সময় টের পেত।

তবু, এখনই সদ্য জলঘাঁটার জন্যেও হওয়া সম্ভব নয়।

কে জানে কিসের জ্বর।

চারিদিকে 'মাব অনুগ্রহ' হচ্ছে। টিকে অবশ্য নেওয়াই আছে—কিন্তু পানিবসন্ত যদি হয় তো টিকেতে আটকাবে না।...

ভাবতেই যেন ভয়ে হিম হয়ে এল হাত পা।

সেদিন ছুটির বার—ইস্কুল যাওয়া ছিল না।

তবু ছেলেকে নিয়েই আটকে থাকতে হয়।

কে ওর পথ্যি তৈরী করে, কে-ই বা প্রবীরের খাবার ব্যবস্থা করে, সেই তো এক মহাসমস্যা।

ইচ্ছে করেই দিনরাতের লোক রাখে নি প্রবীর।

খরচও বেশী—তা ছাড়া এক ঘর—যাকে রাখবে সে কোথায় থাকবে কতখানি বিশ্বাসী—এসব হাজারো প্রশ্ন।

একটা ঠিকে-ঝি সকালের বাসি পাট সেরে, রান্নার যোগাড় করে রেখে তোলা উনুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়—আজ শুধু সাজিয়ে রেখে গেছে।

প্রবীরই বলেছিল।

ছুটির দিনে অনেক বাড়তি কাজ থাকে, সে সব সেরে বেলায় উনুনে আঁচ দেয়।

আজ কিছুই হল না।

অনেক বেলায় খবর পেয়ে ওপরের ঘরের ভাড়াটেরা ছেলের জন্যে একটু বার্লি করে দিলেন, ওর জন্যে খানকতক রুটি।

রেশনের চাল কম দেয়—সে জন্যে ভাত দিতে পারলেন না বলে বার বার ক্ষমা প্রার্থনাও করে গেলেন।

দুধটা স্টোভেই গরম করে রেখেছিল : দুপুরে আবার গরম করতে গিয়ে দেখল কেটে গেছে। টিনের দুধ দিয়ে বার্লি দিতে গেল, ছেলে মুখেও দিল না।

বিকেলে একটু মিশ্রীর জল গরম করে দিল।

সন্ধ্যায় ঝি আসতে তাকে দিয়ে কমলালেবু আনাল, তাকেই কিছু নগদ পয়সা দেবে বলে তাকে দিয়ে নিজের জন্যে একটু খাবার করিয়ে নিল।

কিন্তু এমনভাবে তার কতদিন চলবে—এ প্রশ্নটা হয়ত শ্রীধরের বক্তৃতার জন্যেই আরও—সমস্ত কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকেই বার বার মনে হতে লাগল।

বিশেষ সন্ধ্যের দিকে জ্বরটা খুব বাড়ল, থার্মোমিটার নিয়ে দেখা গেল ১০৪° উঠে গেছে।

ওপরতলার ভাড়াটে ভদ্রলোকই গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিলেন।

তিনি এলেন রাত দশটার পর—এসে মাথায় জলপটি দিয়ে বাতাস করতে বলে গেলেন, তিন রকম ওষুধের প্রেসক্রিপশ্যন করলেন সেই সঙ্গে।

অত রাত্রে কাকে বসিয়ে ওষুধ আনতে যায় সে-ও আর এক সমস্যা।

ওপরের দ্বারিকবাবুদেরই বলতে হল আবার। দ্বারিকবাবুর স্ত্রী এসে বসতে প্রবীর ছুটে গেল ওষুধ আনতে।

তখন বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ। ট্যাক্সি করে শিয়ালদা এসে দুটো পেল, একটা পেল না।

ফিরে দেখল বাতাস করতে করতে ভদ্রমহিলা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ওদিকে জ্বরে ছেলের গা পুড়ে যাচ্ছে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

এ ক্ষেত্রে কাকেও দোষ দেওয়া যায় না।

ওঁরা যা করছেন, যেটুকু করেছেন তাই ঢের।

একে পর—এখানেই এই মাস কতকের পরিচয়—তা ছাড়া মহিলাটিও সারাদিন খাটেন খোটেন, এত রাত্রে একভাবে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়া আশ্চর্য নয়।

সে রাত তেমনি ভাবেই কাটল, পরের দিনও সমস্যা বাড়ল বই কমল না।

ছেলের কাছে অনবরত বসে থাকতে হচ্ছে, ডাক্তারকে খবর দেবার কি ওষুধ আনবার একটা লোক নেই।

ঝিয়ের দ্বারা এসব কাজ সম্ভব নয়। দ্বারিকবাবু পোর্ট কমিশনারে কাজ করেন। সাতটার আগে খেয়ে চলে যেতে হয়।

ঠিক এই বিপদের মধ্যে যেন বাতাসের মুখে খবর পেয়ে শ্রীধর এসে হাজির হল দুপুরবেলা।

নমস্কার করে ঘরের বাইরে থেকে বলল, 'শুনলুম খোকাবাবুর অসুখ! তা বাইরের যদি কোন কাজ থাকে, ওষুধ আনা কি কোন পথ্যি কি—ডাক্তারের কাছে যাওয়া—আমাকে বলতে পারেন বাবু স্বচ্ছন্দে। আজ আমার কাজে যাবার পাট নেই, একেবারে ফিরী। এ বিপদের সময় কোন সংকোচ করবেন না—এটুকু মেহনতের—যদি তেমন কোন সমিস্যে জেগে থাকে মনের মধ্যে—শোধ দেবার ঢের সময় পাবেন পরে।'

এ এমনই একটা নাটকীয় মুহূর্ত যে, প্রবীর 'না' বলতে পারল না।

তখনই ওষুধ আর বরফের জন্যে কাউকে পাঠানো একান্ত দরকার তার।

ডাক্তারকেও একটা খবর দিতে হবে।

এই সময় না গেলে রাত্রের আগে আর তাঁকে ধরা যাবে না।

অগত্যা, বলতে গেলে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই লোকটির কাছেই আত্ম-সমর্পণ করতে হল।

শ্রীধর করলও ঢের।

বুদ্ধিমান এবং কর্মতৎপর লোকের পক্ষে কোন কাজই কঠিন নয়। আর তার ওপর লোকটি একটু হৃদয়বানও, ছুটোছুটি বাজার হাট, ওষুধ পথ্য কিনে আনা, পথ্য তৈরী, মায় প্রবীরের জন্যে একটু ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দেওয়া সমস্তই একা করে গেল।

প্রবীরের প্রবল আপত্তি ও অনুযোগ কোনটাতেই কান দিল না।

খোকা জ্বরের ঘোরে বিছানাতেই প্রাকৃতিক কাজগুলো করে ফেলেছিল। ঝি সকালে 'পরে এস করবো' বলে সেই যে চলে গেছে, আর আসে নি। স্তূপাকার করা কাঁথা, তোয়ালে পড়েছিল, সেগুলোও কেচে দিল নিজে থেকেই।

কাজ করে সে গুছিয়ে, পরিষ্কার করে। এমন কোন মেয়েছেলের পক্ষেও তা সম্ভব নয়।

কাজকর্ম সব সেরে বার্লি, ছানার জল, প্রবীরের খাবার হাতের কাছে গুছিয়ে রেখে রাত নটা নাগাদ বাড়ি গিছল শ্রীধর, আবার সাড়ে দশ-টায় ফিরে এল।

বলল, 'আপনি সেই কাল থেকে রাত জেগে বসে আছেন বাবু, আপনি একটু গড়িয়ে নিন, আমি এখন ঘণ্টা দু'তিন বেশ বসে থাকতে পারব। না না, না বলবেন না। মানুষের শরীর তো, একেবারে ভেঙে পড়লে কে দেখবে তখন ছেলেকে? কথাটা শুনুন—উঠুন দিকি, একটু উঠুন।'

কে এ লোকটা, এমন ভাবে করছেই বা কেন, ঠিক কী মতলব—তা না বুঝলেও এবং সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয়কুটিল দ্বিধা থাকলেও, কতকটা অভিভূতের মতোই উঠতে হল।

কিছুটা স্নানের মতো ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে এসে খেতে বসেছে। খোকাকে বাতাস করতে করতেই নীচু গলায় শ্রীধর বলল, একটা কথা বলব বাবু, দোষ ধরবেন না ? আপনার বিপদের সময় প্যাঁচে ফেলতে কি কায়দায় ফেলতে চাইছি—তাও ভাববেন না। ইচ্ছে হয় 'না' বলে দেবেন স্বচ্ছন্দে। অন্য সময় হয়ত আবার পেড়াপিড়ি করব—এমন কঠিন সময়ে বিপদ ভাঙিয়ে খাব না, এটা ঠিক। বলছিলুম কি, বিজয়াদি বলছিল যে, মানে এইসব কথা শুনে কেঁদেই ফেলল বেচারী, বললে তাই, এসময় তো একটা দিনরাতের ঝিও দরকার, আমাকে নিয়ে চলো, আমি খোকাকে দেখতে পারব—অসুখ কমলেই আমি চলে আসব আবার, বাবুর কোন আপত্য হয় তো না হয় মাইনে বলেই কিছু ধরে দেবেন—?'

পরে, অনেকদিন পরে জেনেছিল প্রবীর যে—এ সবই বানানো, শ্রীধর নিজের দায়িত্বেই বলেছিল, বিজয়ার সঙ্গে এত কথা বলার সময়ই হয় নি ওর—কিন্তু তখন কে জানে কেন, কথাটা বিশ্বাসই হল।

শ্রীধর এত করছে বলেই, ওর আন্তরিকতায় ও সততায় সন্দেহ করার কথা মনে হল না তার।

বিরক্তিও প্রকাশ করল না, রাগও না।

বরং খুব কোমল কণ্ঠেই বলল, 'বিয়ে করার আমার এখন কোন উপায় নেই মিস্ত্রী। স্ত্রী তো আছেন, ডিভোর্স তো করা হয় নি—আজকালকার আইনে এক স্ত্রী বর্তমানে বিয়ে করা চলে না।'

'স্ত্রী জাতকুল খোয়ালেও না ?'

'না। সেটা যে সে খুইয়েছে, আদালতে প্রমাণ করলে আদালত থেকে বিয়ে ভেঙে দেবে। তবে আবার বিয়ে করা চলবে।'

খানিকটা চুপ করে বসে বাতাস করার পর শ্রীধর আবার বলল, 'তা সে তেমন বিয়ে না-ই বা হল বাবু। কালীঘাট গিয়ে একটা মালা বদল করে নিলেই তো হয়। আইন আদালতের ব্যাপার সে করতে যাচ্ছেও না—তার কথাও নেই। আপনি পরিবার বলে পরিচয় না দিলেও তার

দুঃখু হবে না। ঝি হয়ে আপনার কাছে থাকতে পেলেই সে খুশী।···বে হয়েছে কি হয় নি—এসব কথা আদালতে মামলা করতে গেলে তবে তো উঠবে। আপনি তাকে বিনি দোষে কোনদিন ত্যাগ করবেন মনে তো হয় না। আর যদি কোন দোষই করে, আপনি পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেন, তার কি ক্ষ্যামতা বাবু সে আপনার নামে নালিশ করবে। রেজেস্টারী বে'র পরিবার হলেও তো য্যাতক্ষণ না আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে ত্যাতক্ষণ কিছু আদায় করতে পারবে না।···আর নালিশ করতে তো আপনার পরিবার। সে কোন্ মুখে গিয়ে আদালতে দাঁড়াবে? দাঁড়ালেই বা আদালত শুনবে কেন বলুন? না না, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনি একবারটি হুকুম দিন, মেয়েটাকে এনে আপনার পায়ে ফেলে দিই।'

'না না, সে হয় না মিস্তিরী।···ছিঃ, লোকে কি বলবে। আর কিছু না বললেও, ওভাবে আমি একটা মেয়েকে এনে ঘরে তুলতে পারি?—না তার সঙ্গে ঘর করতে পারি? সে হয় না।····বরং তুমি অন্য সম্বন্ধ ছাখো—টাকা পয়সার দরকার হয়, যা লাগে আমার যা সাধ্য আমি দেব।'

বলল বটে কিন্তু গলায় যেন তেমন জোর ফুটল না।

সেদিন সকালের সে বিরক্তি উষ্মা তো নয়ই।

আর সে উষ্মা বা দৃঢ়তা প্রকাশ পেল না বলেই বরং নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল প্রবীর।

বেশ একটু জোর দিয়েই বলল, 'তুমি বিশ্রাম কয়ো গে শ্রীধর, আমি এবার বেশ বসে থাকতে পারব।'

'এই দেখুন বাবু, আপনি আমার ওপর রাগ করে বসলেন। আমি বাড়িতে বলে কয়ে এইচি, এখন আর কিছু সেখানে ফেরা যায় না। আর এখানে যে শুয়ে থাকব—সে ধরুন আমার এই আন্‌টো জায়গায় ঘুম হবে না। তার চেয়ে আর বকাবকি করে দরকার নেই, আপনি শুয়ে পড়ুন—আমার ঘুম পেলেই আপনাকে উঠিয়ে দোব।'

প্রবীর আর দ্বিরুক্তি করল না। পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ল গিয়ে। শ্রীধর ওকে ডেকেছে কিংবা ডাকে নি—কে জানে, ডেকে থাকলেও ওর ওঠা সম্ভব হয় নি, সে আহ্বান কানে গেলেও মাথা পর্যন্ত পৌছয় নি।

ঘুম ভাঙল একেবারে অনেক বেলায়, কারও ডাকে নয়, স্বাভাবিকভাবেও নয়—তীব্র মাথার যন্ত্রণাতেই—প্রবল জ্বরের বিহ্বলতা, যাকে ঘুম বলে মনে হচ্ছিল সকলের—কেটে গিয়ে চোখ চাইতে বাধ্য হল, একটু একটু করে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠল।

প্রথমেই যেটা লক্ষ্য হল ওর—আর তার ফলে ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়েও ক্ষণকালের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখে আবার শুয়ে পড়তে হল—কে একটি তরুণী মেয়ে সযত্নে খোকার গলার নিচে একটা হাত দিয়ে আধবসা করে ধরে একটা ছোট গ্লাস থেকে সম্ভবত দুধ বা বার্লি জাতীয় কিছু খাওয়াচ্ছে, তারই শাড়ির আঁচলটা খোকার বুকে চাপা দেওয়া—ন্যাপকিনের মতো।

অতিশয় সুশ্রী মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই, সুন্দরীও তাকে বলা চলে অনায়াসে।

সুনেত্রার থেকে ঢের ভাল দেখতে।

তার ওপর বুঝি সদ্য স্নান করে এসেছে, ভিজে চুলের রাশি পিঠে এলানো--সামনের দিকে কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া দু-একটি কুঁচো চুলে তখনও জলের বিন্দু টলটল করছে মুক্তোর মতো।

তার মধ্যেই পরিশ্রমে বা লজ্জায় বা ভয়ে—মুখখানা হয়ে উঠেছে যৎপরোনাস্তি রক্তিম, চুলের কোণে কোণে কপালে ঘামের রেখাও দেখা দিয়েছে একটু।

ওর চোখ চাওয়া এবং তার ফলে বিস্ময়-বিহ্বলতা—শ্রীধরের চোখ এড়ায় নি।

সে একটু হাত কচলে প্রসন্ন উদার কণ্ঠে বলল, 'আর কোন উপায় ছিল না বাবু—বিজয়াদিকে না ডেকে।···ওধারে আপনার এই অজ্ঞান অভূতো

জ্বর—এদিকে খোকার গায়ে গুটি। পান অবশ্য, আসল নয়—তবু এও তো কম নয় আপনার—তার ওপর এসব গন্ধ থাকলে লোকেও বড় ঘেঁষতে চায় না, পাছে ছোঁয়াচ লাগে বলে।···তাই আর কোন পথ না পেয়ে—আপনি তো জ্বরে বেহুঁশ একেবারে, মানে জিজ্ঞেস করবো কি মত নেবো তার তো উপায় নেই—দোরে ছিকলি তুলে দে ভোরবেলাই ছুটলুম বাড়িতে—বৌকে গিয়ে বললুম সব, সে-ই বুদ্ধি দিলে, বললে, ছুঁড়িটাকে নিয়ে যাও—এমন বিপদের দিনে কাজে না লাগলে কি শুধু আমোদ করতে যাবে?···তা ওকেও যেমাত্তর বললুম বাবু, ছুটে এল তখুনি। এসেই ঘর দোর, রুগীর ভার সব মাথায় তুলে নিয়েছে। আর কোন ভাবনা নেই বাবু আপনার। রাগও করতে পারবেন না, দুটো প্রাণ বাঁচাতে হলে এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। এক হাসপাতালে দেওয়া তা সে ছোঁয়াচে রোগের হাসপাতালে গেলে কি কচি ছেলেটা বাঁচত?'

আধো জ্বরের বিহ্বলতা, আধো মাথার যন্ত্রণা—তার মধ্যে কতক কানে গেল কতক গেল না প্রবীরের।

সে চেয়ে ছিল বিজয়ার দিকেই।

ততক্ষণে খাওয়ানো হয়ে গেছে, খোকাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়েছে—তারপর কাঠ হয়ে আছে কাঠগড়ার আসামীর মতো, হাকিমের রায় শুনতে।

সে রায় আর দেবার সাধ্য ছিল না প্রবীরের।

মাথা খসে যাচ্ছে এত যন্ত্রণা।

চোখ চেয়ে থাকার শক্তি নেই।

সে শ্রান্ত হয়েই চোখ বুজল।

তারপরও আর কিছু মনে নেই।

ডাক্তার আসছে, পথ্যিও খাওয়াচ্ছে কে, খোকাটা কাকে যেন 'মা' বলে ডাকছে আবার—এসব আবছা আবছা ঝাপসাভাবে কানে আসছে, মাথাতে যাচ্ছে আরও কম।

একবার সে কাকে বলছিল, 'বিছানার তলায় চাবি আছে, বাক্স খুলে দরকার মতো টাকা বার করে নিও'— সেও ঠিক মনে নেই।

শ্রীধরের গলা সে মাঝে মাঝেই পায়, শ্রীধর যেন কাকে বলছিল, 'ঐ যে খাতাটা আছে—কী কী খরচ হচ্ছে সব লিখে রেখো—তুমি তো লেখাপড়া জানো, এরপর যেন না কোন সন্দ হয় বাবুর এত খরচ কিসে হল।'

কিন্তু সে যেন আর কোথায় বলছে, আর কাকে। প্রবীরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সে শুধু এমনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতে চায় একটু—এসব হিসেব-নিকেশ চিন্তা ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেয়ে।

১১

ভাল হয়ে ওঠার পর বিয়ে একটা হয়ে গেল ওদের।

শ্রীধরই উদ্যোগী হয়ে সব করাল।

পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়ে পাঁচজনকে সাক্ষী রেখেই একটা অনুষ্ঠান করা হল।

স্ত্রী-আচার হল না, পুরোহিত নিজেই সম্প্রদান করলেন।

শ্রীধর বলেছিল কালীঘাটে গিয়ে মালা বদল করার কথা, প্রবীর তাতে রাজী হয় নি। আইনের চোখে যা হোক, বিয়েটা শাস্ত্র-মতেই করতে চায়, নইলে পুরোপুরি সহধর্মিণীর মর্যাদা সে দিতে পারবে না হয়ত কোনদিনই।

মেয়েটার দিক থেকেও একটা সংকোচ, একটা অপমান-বোধ থেকেই যাবে।

বিয়ের পরও কিছুদিন একটা অস্বস্তিতে কেটে ছিল বৈকি।

কিন্তু তার ওপর প্রবীর যেমন একটু একটু করে নিশ্চিন্ত হল, সহজ হয়ে এল—বহুকালের গুমোটের পর একটু দক্ষিণা বাতাসের ভাব জাগল ওর মুখে-চোখে-মনে—ও আশা করেছিল বিজয়াও তেমনি সহজ ও স্বচ্ছন্দ হবে, হাসিখুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, প্রবীরের নিরানন্দ গৃহে আবার আনন্দের প্রদীপটা জ্বলবে।

কেন যে সেটা হচ্ছে না, কেন বিজয়ার মুখে সেই তৃপ্তির হাসিটি ফুটছে না, প্রবীর যেটা আশা করেছিল—অথবা বহুদিন পর্যন্ত আশা করতে সাহস করে নি—এখন আবার নতুন করে যেন সেই প্রশ্নটাই অশান্তির

কারণ হয়ে উঠল।

প্রথমটা অন্য ভয় ছিল।

এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যে ভয় থাকার কথা, যে ভয় দেখা দেবার কথা মনে।

এ অ ত অস্বাভাবিক মিলনের প্রস্তাব থেকেই সে আশঙ্কার শুরু (এটাকে বিবাহ বলা চলে কিনা—প্রবীরের মনে সে প্রশ্নটাও থেকে গেছে ; প্রথমতঃ বে-আইনী, দ্বিতীয়তঃ অনুষ্ঠানের আগে থেকেই যে ঘর করছে, অজ্ঞাতকুলশীল একটি মেয়ে, যে দাসী হয়েই থাকতে এসেছিল, তাকে সহজভাবে স্ত্রী ভাবতে কেমন যেন একটা সংকোচের ভাব থেকেই যায়, এটা জন্মগত সংস্কারের ফল)।

এমনিই যে-কোন বিয়ের আগেই নাকি সকলের একটা দুশ্চিন্তা থাকে—বিশেষ আজকাল, বেশী বয়সে, জীবনে প্রবেশ করার পর বিয়ে করতে যায় বলে।

সেটা স্বাভাবিকও, অল্প বয়সে বিয়ে করার সেই বিমল আনন্দ, ফূর্তি, দায়িত্বজ্ঞান আসার পর সম্ভব নয়।

কিন্তু সে অন্য ধরনের দুশ্চিন্তা। যে আসছে সে কেমন হবে না জানি আমার সঙ্গে বনবে কিনা, আমার সংসারের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কিনা—এই ধরনের আশঙ্কা-কণ্টকিত চিন্তা

প্রবীরের ভয়টা অন্যত্র।

বিয়ের চেহারাটা কি—তা সে আগের বারেই দেখে নিয়েছে, এ সম্বন্ধে কোন মোহ কোন স্বপ্নই নেই আর।

তার এ বিয়ে নিতান্তই প্রয়োজনের।

সুতরাং স্ত্রীর কাছ থেকে আবেগ-ভরা প্রেম ভালবাসা আশা করে না যখন, সংসার বলতে কেউ নেই এখানে, না মা না বিধবা বোন, না কোন বৌদি বা ঐ ধরনের আত্মীয়স্বজন—তখন সাধারণত যে সব অশান্তি কল্পনা করে মানুষ সে সবের কোন কারণই নেই।

ওর আশঙ্কা ছিল ছেলের জন্যেই।

যে আসছে সে তার সপত্নীপুত্রকে কি চোখে দেখবে।

ভাল না বাসুক, বিদ্বেষের চোখে না দেখে।

যতই হোক সৎমা ; চিরদিন ধরেই শুনে আসছে যে সৎমারা কখনই সতীনপোদের সুনজরে দেখতে পারেনা, তাদের যত্ন করেনা—অনেকেই তাদের মৃত্যু কামনা করে।

বিশেষ নিজের ছেলে হয়ে গেলে তো আরও। স্বামীও যে আগের পক্ষের ছেলেকে ভালবাসবে কি যত্ন করবে তাও এদের সহ্য হয় না।

এমন অশান্তি করে যে সেইজন্যেই ভয়ে স্বামীদের চোখ বুজে থাকতে হয়—নইলে জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে।

প্রথম পক্ষের ছেলেকে বেশী ভালবাসছে জানলে তো কথাই নেই,—আরও বিষ হয়ে ওঠে সে সন্তান—'সতীন-কাঁটা', কোন ফাঁক পেলেই কোন একটা ছুতো ধরে অকথ্য নির্যাতন করে—সেই ছেলে বা মেয়েকে।

এ সবই জানা ছিল, চিরদিন সে লোক-পরম্পরায় শুনে আসছে—তবু প্রবীরকে এই বিয়ে করতে হয়েছে।

করতে হয়েছে ঐ ছেলের জন্যেই।

একেই বোধহয় বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

মা-হারা তিন বছরের ছেলে অশোক, তাকে কে দেখবে—এই জন্যেই ঘরে একটি মেয়েছেলে থাকা অত্যাবশ্যক বলেই বিজয়াকে আনতে বাধ্য হয়েছে।

ওর মা যখন যায় তখন মাত্র দেড় বছরের ছেলে অশোক, তবু এতটা আতান্তরে পড়ে নি, কারণ তখন প্রবীরের মা বেঁচে ছিলেন।

তিনিও যে এমন হঠাৎ টপ করে মারা যাবেন তা কেউই ভাবে নি।

এমন কিছু বয়সও হয় নি তাঁর।

প্রবীরের এই তেত্রিশ বছর বয়স, ওর দাদার তা হলে আটত্রিশ হয়েছে—দাদার থেকে মা নাকি মাত্র উনিশ বছরের বড়।

বড় জোর তাঁর ছাপান্ন-সাতান্ন বছর বয়স হয়েছিল।

মা মারা গেলে স্বভাবতঃই বৌদির কথা মনে আসে।

কিন্তু বৌদি তেমন নন।

বিয়ের পর থেকেই তাঁর চিন্তা কেমন করে এদের বাদ দিয়ে আলাদা থাকবেন।

সেই ব্যবস্থাই করেছেন।

তাঁরই ক্রমাগত বাক্যযন্ত্রণায় তদ্বির করে দাদা দিল্লীতে বদলি হয়ে গিয়েছে এবং তারপর থেকে এদের সঙ্গে সম্পর্কও রাখে নি।

মাকেও কখনও এই পাঁচ ছ' বছরে একটা টাকা পাঠায় নি দাদা, ওর বিয়েতেও আসে নি।

অথচ এমন কোন কলহ বিবাদ করে পৃথক হয় নি ওরা, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়ার মতো কোন কারণ ঘটে নি।

সুতরাং মা মারা যাওয়ার পর অশোককে দেখাশুনো করাই প্রবল সমস্যা হয়ে দেখা দিল।

ইস্কুল মাস্টারের জীবন প্রবীরের তাও বড় কোন সরকারী ইস্কুলের চাকরি নয়—নেহাতই এক শহরতলির অখ্যাত ইস্কুলে মাস্টারী করে সে।

ফলে টিউশ্যনী একটা ছুটো করতেই হয়—ঐ বৃত্তির অঙ্গ হিসেবেই, নইলে সংসার চলে না।

হয় সকালে নয় বিকেলে অথবা ছু'বেলাই অর্থাৎ দীর্ঘ সময় বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকতে হয়।

তাহলে ছেলেকে দেখে কখন?

এই সময়টা এর ওর বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে দিয়ে যেতে হয়।

তাদের সবাই যে যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হবে তার কোন মানে নেই, কেউ কেউ খুবই অবহেলা করেছেন এর মধ্যে।

একদিন তো ভবানীবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই সি. আই. টি. রোডের মোড় পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, কেউ লক্ষ্যই করে নি।

দৈবাৎ সেদিন প্রবীর সকাল করে বাড়ি ফিরছিল তাই, আর ঐ পথেই হেঁটে ফিরছিল—তাও ছেলে 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে না উঠলে অত ভিড়ের মধ্যে সেও লক্ষ্য করত কিনা সন্দেহ।

তবু এত সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত বিবাহের কল্পনা পর্যন্ত ভাবনার মধ্যে আসতে দেয় নি প্রবীর।

তার আগে ডিভোর্স করা দরকার।

জটিল মামলা মকদ্দমা না হোক, আইনের পিছনে ছুটোছুটি।

তা ছাড়া আবার ও কী প্যাঁচে পড়বে তার ঠিক কি। আবার কোন্ মেয়ে আসবে, কী অশান্তির আগুন জ্বালবে তাই বা কে জানে।

প্রধানত আবার বিয়ে করলে ছেলের জন্যেই করতে হয়—কিন্তু সেখা-নেই যে মস্ত একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সতীনপোকে কি সে বৌ দেখবে! যত্ন না করুক—দায়িত্বটা পালন করবে?

মেয়েছেলে মাত্রেই একটা বিভীষিকার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে প্রবীরের কাছে।

বৌদিকেও দেখল, নিজের স্ত্রীকেও।

কোন্ পঙ্ককুণ্ড থেকে সুনেত্রাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সে—তা সুনেত্রারই তো বেশী জানার, বেশী করে বোঝার কথা।

ইংরেজীতে যাকে বলে gutter থেকে উদ্ধার করে আনা, তা-ই এনে-ছিল।

তাতেও তো সুনেত্রাকে ধরে রাখতে পারল না।

সুখী করতে পারে নি বলেই ঘরে রাখা সম্ভব হয় নি। নিজের ছেলেকে —অমন ফুলের মতো সুন্দর ছেলেকে ছেড়ে চলে গেল অনায়াসে!

আর, যে মা নয়—এমন মেয়ে এসে কি প্রবীরের ঘরে সুখী হবে, এ ছেলের প্রতি মমতা বোধ করবে?

এ দ্বিধা এ সংশয় কোনদিনই যেত না তার—হাজার অসুবিধা, ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হাজার চিন্তা সত্ত্বেও,—যদি না দমকা ঝড়ের মতো এত-

গুলো অঘটন ঘটে যেত তার জীবনে।

কোথা থেকে শ্রীধর এল তার উদ্ভট আজগুবি প্রস্তাব নিয়ে—আর সঙ্গে সঙ্গে এল ঐ সাংঘাতিক অসুখ—যেন একটা ভূমিকম্পে তার জীবনটা ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

যে অসুখে লোকে সর্বরকম ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে চায়, সেই অসুখে যে মেয়েটা স্বেচ্ছায় বিনা আহ্বানে এসে দিনরাত জেগে দু'টো রোগীর সেবা করে সুস্থ করে তুলল, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি স্বাস্থ্যের দিকে না চেয়ে, তার চেয়েও বড় কথা দুর্নামের ভয় না করে—তাকে আর ভাল হয়ে ওঠার পর 'তুমি যাও' বলতে পারল না।

তা ছাড়াও শুধু কৃতজ্ঞতা নয়—ঐ মেয়েটার সেবা এবং গৃহিণীপনার একটা নেশাও লেগে গেছে তখন।

এ সেবা মার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

যার কাছ থেকে পাবার কথা সে স্ত্রীর কাছ থেকেও পায় নি কোনদিন। সে-ই উল্‌টে যেন সেবা করে গেছে স্ত্রীর, তার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রাণপাত করে গেছে।

সেটা করতে পেরেছিল—এই ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সেবার অভিজ্ঞতা ছিল না বলে।

সত্যিই অদ্ভুতকর্মা মেয়েটা।

অশোক তো প্রথম থেকেই 'মা' বলতে শুরু করেছে। সত্যিকার মার মতোই আঁকড়ে ধরেছে ওকে।

এরপর তাকে বাদ দিয়ে আবার সেই নিরানন্দ কষ্টদায়ক সমস্যাসংকুল নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার কথা আর ভাবাও যায় না।

বলতে গেলে জীবনে এই প্রথম সুখের মুখ দেখল প্রবীর।

আরামেরও।

তার দরিদ্রের গৃহস্থালিতেও যে, এত স্বাচ্ছন্দ্য এত তৃপ্তিদায়ক ব্যবস্থা

এবং ভোজ্যের আয়োজন করা যায়—উপকরণের দৈন্য সেবা ও মনোযোগে, আন্তরিকতায় পূর্ণ করা যায়, এ সম্বন্ধে এতদিন কোন ধারণাই ছিল না প্রবীরের।

ছেলেটার অযত্ন হচ্ছে না, হবে না বলেই মনে হয়। লোক-দেখানো যত্ন দুচার দিন করা যায়।

তারপর এমন কি তার মধ্যেও অমনোযোগ ও বিরক্তি ধরা পড়ে।

বিশেষ প্রবীরের মতো এমনভাবে লক্ষ্য করলে সামান্য ত্রুটি বা মনের আসল চেহারাটা ধরা পড়বেই।

না, সেদিকেও কোন ত্রুটি বা ফাঁক নেই।

সুতরাং প্রথমে কৃতজ্ঞতা, পরে প্রবল আবেগ একটা অনুভব করল প্রবীর —বিজয়া সম্বন্ধে।

এও তার জীবনে প্রথম।

এখন বুঝতে পারে এমনভাবে সে সুনেত্রাকে কোনদিন ভালবাসে নি, ভালবাসতে পারে নি—এমন প্রবল হৃদয়াবেগের সঙ্গে!

সুনেত্রাই বাসতে দেয় নি।

প্রথম বিবাহিত জীবনের বিহ্বলতার ক'টি দিন বাদ দিলে—যখন মানুষ অত বিচার করে না, হিসেবনিকেশ করে দেখতে পারে না, এক তরফা দিয়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে—কখনই সে এমন একটি কোমল সুন্দর প্রেম অনুভব করতে পারে নি।

এর মধ্যে যে এমন মাধুর্য আছে, এমনভাবে দিনরাত কারও চিন্তা যে এমন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে তাও জানত না।

সম্ভবত নিজের তরফ থেকে এতখানি আবেগ ও প্রেমের জন্যে সে এটাও অনুভব করে যে—এও এই প্রথম—বিজয়ার তরফ থেকে কোথায় একটা বাধা আছে মনের মধ্যে।

এটা যে কোন কুণ্ঠা হতে পারে, তার নিজের কোন দৈন্য সম্বন্ধে সচেতনতা, তা ভাবে না। ভাবার কথা মনে পড়ে না।

এটাকে সে ওদিকের প্রেমের বা আবেগের অভাব বলেই মনে করে। ভাবে সে বিজয়ার মনের মতো হতে পারে নি।

'ঘরে-পোড়া গরু'র অবস্থা তার বলেই আরও এই ভাবে সে চিন্তা করে।

অথচ—বিজয়ার অন্য আচরণের সঙ্গে আবার এই প্রণয়ের অভাবটা মিশিয়ে নিতে পারে না।

এত সেবাযত্ন যে করে, এমন পূজোর মতো ক'রে এমন অতন্দ্র অস্খলিত সেবা—দিনরাত যে ওর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ওর মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত ব্যগ্র থাকে—তার মনে ওর প্রতি বিরাগ বা অবজ্ঞা থাকবে, ঘৃণা কি বিদ্বেষ —তাও তো সম্ভব মনে হয় না।

এই হিসেবটা মিলিয়ে নিতে পারে না কিছুতেই।

শুধুই কি কৃতজ্ঞতা, আশ্রয় হারাবার ভয় ?

তা হলেও এতটা তো করার প্রয়োজন ছিল না, এর চেয়ে অনেক কমেই তো প্রবীর খুশী হতো—বিজয়াও অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারত প্রবীরের

শেষে একদিন মনের সংশয় ও উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারে না প্রবীর। সোজাসুজি বিজয়াকে প্রশ্ন করে।

বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের গালটা ওর কপালে চেপে ধরে বলে, 'বিজয়া একটি সত্যি কথা বলবে? আমার এখানে কি তুমি সুখী হতে পারছ না? আমার কোন আচরণ, আমার স্বভাব কি তোমার খারাপ লাগছে? না গোটা মানুষটাকেই তোমার অপছন্দ? সত্যি করে বলো— কোন সংকোচ করো না। স্বভাব হয়ত বদলানো যায় না কিন্তু আচার-আচরণে সংযত সাবধান হওয়া যায় বৈকি!'

প্রশ্ন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে শিউরে উঠেছিল বিজয়া, প্রবীরের সেটা টের পেতে অসুবিধা হয় নি।

এখন, ওর বক্তব্য শেষ হতে—অনেকক্ষণ যেন আড়ষ্ট পাথরের মতো হিম নিশ্চল হয়ে বসে রইল তার পর আস্তে আস্তে বলে, 'কেন, এ কথা

বলছ কেন ? আমার ব্যবহারে কি কোন দোষ অন্যায় হচ্ছে ?'

'তা হচ্ছে না বলেই তো প্রশ্নটা এত অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে বিজয়া। বড় বেশী নিখুঁত তুমি, নিজেকে তোমার কাজকর্মের মধ্যে বড় বেশী মিলিয়ে দিয়েছ তার মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু সেবাতে পুরুষের মন ভরে না বিজয়া—সে রক্তমাংসের মানুষটাকে চায়—পরিপূর্ণভাবে। সে এমন স্ত্রী চায় যে ভালবাসবে, ভালবাসা চাইবে, জোর ক'রে আদায় করবে মনোযোগ, না পেলে ঈর্ষিত হয়ে রাগারাগি করবে—এই গোটা মানুষটা না পেলে স্বামীদের মন ভরে না। তুমি তোমাকে অপরিহার্য ক'রে তুলেছ আমার জীবনে—কিন্তু আমি তোমার কাছে অপরিহার্য কি না সেটা বুঝতে দিচ্ছ না যে। আমি তোমাকে শুধু নয়—তোমার ভালবাসাও যে চাই বিজয়া।'

বিজয়া আরও কিছুক্ষণ তেমনি স্থির হয়ে বসে থাকে ওর বুকের মধ্যে যেন মিশে গিয়ে।

তারপর বলে, 'আমি তোমার কাছে যে সুখে শান্তিতে যে মর্যাদায় আছি, খোকাকে পেয়ে আমার বুক ভরে গেছে—তার পর কি কোন অতৃপ্তি থাকা সম্ভব। আমার কেবলই মনে হয় যে আমিই তোমার যোগ্য নই, মনের মতো হ'তে পারি নি।'

'উঁহু—আমাকে অত সহজে ফাঁকি দিতে পারবে না। এর কোন কথাটাই আমার উত্তর হল না।'

'তুমি—তুমি কি বুঝতে পারছ না আমার মনটা। বুক চিরে দেখাবার হলে দেখাতুম—আমি কত কৃতজ্ঞ। তোমার মতো দেবতা স্বামী পাবো এ কি কোন দিন আশা করেছিলুম ? কোন্ দিন এই সৌভাগ্য হারাতে হয়—এই ভয়েই আমি বরং কাঁটা হয়ে থাকি।'

অনেক চেষ্টা করেই যেন সহজ হয় বিজয়া, অন্তত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না শেষ পর্যন্ত। অকস্মাৎ তার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ে—প্রবীরের বুকটা ভিজিয়ে দেয়।

প্রবীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'তুমি এত দুঃখ পাবে জানলে কথাটা তুলতুম না। তোমার কৃতজ্ঞতা যে পেয়েছি তা আমিও জানি—কিন্তু তাতেই আমার আপত্তি, আমি চাই ভালবাসা, দুজনে সমান হতে চাই। কৃতজ্ঞতার সম্পর্কে সে ভালবাসা পাওয়া যায় না।···তোমার মনে কোথায় একটা ব্যথা আছে বিজয়া—বিপুল ব্যথা, সেইটেরই ভাগ চাইছি। ভাল না বাসলে সেটা দেওয়া যায় না। কিন্তু আজ থাক এসব কথা। তোমার চোখে জল দেখলে আমার কত কষ্ট হয় তা কি বোঝ না?

১২

প্রশ্নটা নিরুত্তর থেকে যায় বলেই কাঁটার মতো খচখচ করে প্রবীরের মনে। ওর দিক থেকে ভালবাসা যত প্রবল হয়ে ওঠে—অন্তত ওর মনে হয়—বিজয়া সেইপরিমাণেই যেন কাঠ হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে, ততই আড়ষ্ট।

এইটেরই কারণ বুঝতে পারে না, কেবল নিজেকে প্রশ্ন করে সে বার-বার—আর নিজের মতো করে একটা কারণ খাড়া করতে চেষ্টা করে, তার কোনটাই টেঁকে কী শেষ পর্যন্ত, ভেতরে ভেতরে আরও অস্থির আরও ক্ষতবিক্ষত হয়।

প্রশ্ন করে বিজয়াকেও—কিন্তু কোন বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পায় না। শুধু লক্ষ্য করে যে বিজয়া এই ধরণের প্রশ্নে, এই প্রসঙ্গে যেন ভয় পায়, দুঃখিত হয়, কান্নাকাটি করে। তার আচরণে কাজে কথায়-- আরও নিখুঁত হবার চেষ্টা করে, আরও মনোযোগ দেয়।

ভালবাসে বলেই বিজয়াকে আঘাত দিতে আর মন সরে না প্রবীরের। নীরবে নিজের প্রশ্নের বোঝা বহন করে, শুধু নিজে ক্ষতবিক্ষত হয় কিন্তু বিজয়ার গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেয় না ওর এই সংশয়ের।

শেষে একদিন বিনা প্রশ্নেই এর উত্তর পেয়ে গেল। কিন্তু পাবার পর মনে হল—না পেলেই ভাল হত।

খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে এ বিছানায় শুতে এলে প্রবীর হঠাৎই তাকে বলে ফেললে, 'ভাবছি সামনের শনিবার তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো ?'

'ডাক্তার ?' বিজয়া চমকে ওঠে, 'ডাক্তার কী হবে ? আমার কি অসুখ করেছে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে ?'

তারপর হেসে বলে, 'না কি ভাবছ মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে নাকি ?'

হাসে প্রবীরও।

বলে, 'তা একরকম তাই বলতে পারো। তোমাকে নিয়ে যাবো একজন বড় গাইনোকালজিস্ট, ডাঃ নন্দীর কাছে।···তোমার ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন, দেখানো দরকার। যা বুঝছি একটা বাচ্চা না হলে তোমার মনটা বসবে না এখানে, পর পর ভাবটা ঘুচবে না। তুমিই যে এ সংসারের সব —এই বোধটা আসবে না কিছুতে।'

জড়িয়ে রেখেছিল বুকের মধ্যে—সুতরাং সামান্য দৈহিক প্রতিক্রিয়াও বুঝতে অসুবিধে নেই।

বিজয়া যে মুহূর্ত মধ্যে একেবারে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে উঠল, তা ঠিক সেই মুহূর্তেই টের পেল সে।

'কী হল—বীজু ? আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল প্রবীর।

তারপর আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওকে সহজ হবার সময় দিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার বলো তো—হঠাৎ হঠাৎ তুমি এমন কাঠ হয়ে যাও কেন ? এর মধ্যে ভয় পাবার কি আছে ? ডাক্তার দেখবেন তাই ? ডাক্তার নন্দী বুড়ো মানুষ, তোমার বাবার মতো—দেখলেনই বা।'

ঠিক যে এই ভয়ই নয়—এরকম একটা আশঙ্কাই মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। সে ধারণা এই গত ক মাসের আচরণে গড়ে ওঠা স্বাভাবিকও।

ইচ্ছে করেই এই পথটা তাই ধরিয়ে দিল প্রবীর।

মিথ্যে কথাই বলুক, মিথ্যে বলেই নিশ্চিন্ত করুক তাকে !

কিন্তু বিজয়া সে সহজ পথ দেখতে পেল না।

অথবা আর মিথ্যার জাল বুনবে না সে, এই তার প্রতিজ্ঞা।

সে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্বামীর আলিঙ্গন থেকে—

অন্ধকারেই উঠে বসল বিছানায়।

তারপর কেমন এক অস্বাভাবিক রকমের শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি ও চেষ্টা করো না। বাচ্ছা—ছেলেমেয়ে আমার কোনদিনই হবে না।'

'তার মানে ? কে বলছে এ কথা ? এত পণ্ডিতি আবার কে করতে গেল তোমার সঙ্গে ?'

সত্যিসত্যিই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল এবার প্রবীর।

আশঙ্কা বা সংকোচ কোন্‌দিকে তার একটা আভাস পেয়ে যেন সহজও হয়ে উঠল খানিকটা, উৎসাহিতও। বিজয়াকে সান্ত্বনা দেবার একটা পথ পেয়ে গেল—এই উৎসাহ।

কিন্তু সে উত্তেজনা ও উৎসাহ এক মুহূর্তেরও অবলম্বন পেল না বোধহয়।

আরও শান্ত আরও শীতল, কেমন এক ধরনের অশ্রুবিকৃত অথচ নিস্পৃহ কণ্ঠে বিজয়া বলল, 'আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি নি—এই তোমার ভয়। তা নয়—ভালবেসেছি বলেই সুখী হতে পারি নি। এমন ভাল আর কাউকে বাসী নি জীবনে ; এমন ভালবাসবার মতো লোকও পাই নি, সে অবসরও না। ভালবেসেছি বলেই, দিন দিন সে ভালবাসা মনের আধার উপচে উঠেছে বলেই, তোমাকে হারাবার ভয়ও বেড়েছে। অমন পাগলের মতো সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তোমাকে চেয়েছি বলেই এত ভয় আমার। এ যে কি লড়াই আমার ভেতরে—কী যন্ত্রণা তা তোমাকে বোঝাতে পারব না—কোন পুরুষই কোনদিন বুঝবে না। দেবতার মতো ভগবানের মতো ভক্তি তুমি আদায় করে নিয়েছ আমার কাছ থেকে—যত তোমাকে চিনেছি বুঝেছি, ততই তোমাকে ঠকানো, তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে—অথচ সত্যি কথাও বলতে পারি নি পাছে তুমি সে কথা শুনে আমাকে ঘেন্না করো, আমাকে তাড়িয়ে দাও। আমি—আমি আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। অনেক লজ্জা অনেক অপমান সয়েও—নিজের ওপর অনেক ঘেন্না নিয়েও বেঁচেছিলুম, হয়ত তখনও আমার জীবনের সাধ আশা পোরে নি

বলে—কিন্তু তোমাকে পেয়ে বুঝেছি এই জন্মেই মরতে পারি নি। এই পাওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল বলেই। কিন্তু তোমাকে পাওয়ার পর—জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্য আর সুখের স্বাদ পাবার পর তা হারিয়ে আর বাঁচতে পারব না।'

'কী এমন কথা তোমার, এমন কি তোমার থাকতে পারে তোমার জীবনে যা জানলে আমি তোমাকে ঘেন্না করব? তাই যদি মনে করো তো না-ই বা বললে সে কথা। তুমি আমাকে ভালোবাসো এইটুকু জেনেছি, বিশ্বাস করেছি—এতেই আমি খুশী, নিশ্চিন্ত, তৃপ্ত। তোমার বিগত জীবনের পাঁক—যদি তেমন কোন পাঁক থাকে—না-ই বা আমি ঘাঁটলুম। তোমার বর্তমানটার সঙ্গেই আমার আসল সম্পর্ক—আমার, আমাদের ভবিষ্যৎ তার সঙ্গে গাঁথা। তাইতেই সন্তুষ্ট থাকি না আমরা?'

'না, তা হয় না'—দৃঢ় কণ্ঠে বলে বিজয়া, 'আমিই আর এ সহ্য করতে পারছি না, এই নিজের সঙ্গে অবিরাম লড়াই, দিনরাত একটা অপরাধের বোঝা বওয়া, প্রতিদিন প্রতিটি মিনিট তার ভার বাড়িয়ে যাওয়া।… তোমার আমার মধ্যে এই মিথ্যের পাঁচিল যতদিন থাকবে—ততদিন এ যন্ত্রণা যাবে না।…যা হবার তা আজই হয়ে যাক। সব জেনেও যদি আমাকে খোকার ঝি হিসেবে বাড়িতে থাকতে দাও—তার চেয়ে বেশী কোন পাওনা চাইব না, দাবি করব না। তারপর তুমি সুনেত্রাদিকে ডিভোর্স করে ভাল দেখে একটি মেয়ে দেখে বিয়ে করো। সত্যিকার ভাল মেয়ে—শুধু আমাকে তাড়িয়ে দিও না, আমি ঠিক ঝিয়ের মতো থাকব—ঝি-ই বলো সবাইকে—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে আর এ জীবনে মরা ছাড়া কোন পথ থাকবে না!'

'এসব কি যা তা পাগলের মতো বকছ বিজয়া! কী হল কি আজ তোমার? নেশা ভাঙ করেছ নাকি?'

প্রবীর জোর ক'রেই কাছে টানতে যায় আবার।

কিন্তু বিজয়া আসে না, তেমনি ধীর ভাবেই সেই আকাঙ্ক্ষিত আলিঙ্গন

থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'না, আজ সব কথা বলে এই মিথ্যে জীবনের নাগপাশ থেকে বাঁচতে হবে আমাকে। সব খুলে বলব আজ। বহুদিন ধরেই ভাবছি বলব—সাহসআর হচ্ছে না। কিন্তুআর না—আর দেরি করব না। তুমি ক'টা মিনিট আমাকে সময় দাও লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।'

তারপর আস্তে আস্তে তেমনি অশ্রুরুদ্ধ, বার বার লজ্জায় ঘৃণায় বুজে আসা গলায়, সে তার লজ্জার ইতিহাস, তার আত্মনাশের ইতিহাস খুলে বলে—একটি একটি করে সব ঘটনাই।

কিছুই গোপন করে না। তার যে আরজীবনে ছেলেপুলে হবে না, হওয়া সম্ভব নয়—সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে ভবেশ জোর করে—সে কথাও, মায় সুনেত্রার সঙ্গে পরিচয় তার, দুর্গতি—এই বিবাহের ষড়যন্ত্রও যে সুনেত্রারই—সে-ই যে ওকে খুঁজে বার করে এই কাজে রাজী করিয়েছে—তাও।

আজ আর সে কোথাও কোন আবরণ রাখবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একটি কথাও গোপন করবে না সে স্বামীর কাছে, তাতে অদৃষ্টে যা থাকে থাক।

প্রথমটা ঝোঁকের মাথায় বলে গিয়েছিল—তখন লজ্জা ও অনুতাপে গলা বুজে এলেও অন্য কোন অনুভূতি মাথা তুলতে পারে নি।

এখন শেষের দিকে, এই বিপুল অপরাধ ও প্রতারণার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে আশঙ্কাতে যেন ভেঙে পড়ল।

কোনমতে আরও জড়িয়ে জড়িয়ে প্রায় অনুচ্চারিত কটা শব্দে পূর্বেরই আবেদনের পুনরাবৃত্তি করল, সে স্ত্রীর মর্যাদা চায় না, আশাও করে না। খোকার ঝি হয়ে থাকতে পারলেই সে নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করবে। প্রবীর আর একটি ভাল মেয়ে বিয়ে করে সুখী হোক। ইত্যাদি—

প্রথমটা এমনিই, বিজয়ার অনুরোধেই স্থির হয়ে শুনছিল প্রবীর, তারপর পাথর হয়ে গিয়েছিল।

বিস্ময়, অপমানবোধ, লজ্জা, ক্ষোভ, বিরক্তি, আত্মধিক্কার—সর্বোপরি ভাগ্যের ওপর অপরিসীম, অপরিমাণ ক্রোধ—এতগুলো বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী প্রবল আবেগে তার অনুভূতি-শক্তিকে কিছুক্ষণের জন্যে যেন নিষ্ক্রিয় জড় করে দিয়েছিল।

বিজয়ার বক্তব্য শেষ হওয়ার পরও তাই বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে প্রবীর, তারপর ভাগ্যের-হাতে বারবার-চরম-মার-খাওয়ার-ফলে কঠিন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যাওয়া কণ্ঠে সে উত্তর দেয়, 'তা হয় না বিজয়া—একটু ভেবে দেখলেই সেটা বুঝতে পারতে। তোমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছি, এ বাড়িতে এ পাড়ায় অনেকেই জেনেছে যে আমি আবার বিয়ে করে তোমাকে নিয়ে সংসার পেতেছি। এখন তুমি ঝি হয়ে থাকবে—লোকে কি বলবে, আমিই বা মুখ দেখাবো কি করে? এ যে সম্ভব নয়—তা তুমিও জানো, এটা—এ প্রস্তাবটাই এক ধরনের ন্যাকামি।'

তারপর একটু থেমে, বোধকরি গলার কাছে ফেনিয়ে ওঠা দিক-দাহকারী প্রচণ্ড উষ্মা দমন করে নিয়ে আবার বলে, 'একথা তুমি না বললেই পারতে। আমি অনেক—অনেক দিন পরে একটু সুখের মুখ শান্তির মুখ দেখেছিলুম। বোধহয় ভাবলে, কোন না কোন দিন একথা কানে আসতে পারে,সেদিন কিছু বলবার মুখ থাকবে না। এতখানি প্রতারণা আমি সইতে পারব না। খুব আগ্‌লী কিছু একটা করব তখন—তাই আগে থাকতে সত্যি কথার সাফাই গেয়ে রাখলে; আমি অনেক ভেবেছি,নিজে থেকে দোষ স্বীকার করলে, হয়ত একটু বকাবকি রাগা-রাগি করেই অব্যাহতি দেব।...এটা খুব মাথা ঘামিয়েছ কিন্তু। খুব কূট বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ।...উঃ, কী সাংঘাতিক তুমি বিজয়া!...অথচ তোমাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলুম—এমন করে তাকে কখনও ভাল-বাসতে পারি নি হয়ত। তুমি আমাকে ভালোবাসো এইটে ধারণা হয়ে ছিল বলেই এত ভালবেসেছিলুম।...মেয়েছেলে জাতটাই কি সাংঘা-তিক! লোক সাপের সঙ্গে তুলনা দেয়, সাপও এর থেকে অনেক ভাল।

তোমাকে দেখলাম, সেই তাকে—সেই মেয়েছেলেটাকে, যাকে স্ত্রী বলতে শব্দটা গলায় আটকে যায়, যে আমাকে ফেলে এমন ছেলেকে ফেলে সাজানো সংসার ফেলে ঐ লম্পট বর্বর লোফারটার সঙ্গে চলে যেতে পারল অনায়াসে। দেখেছি বৌদিকেও। আজ মনে হয় মা বলেও ভক্তি করার কিছু নেই। সেও এই স্পিসীরই জীব। সামান্য স্বার্থের জন্যে, সামান্য জৈব-লালসা চরিতার্থ করার জন্যে তোমরা না করতে পারো এমন কাজ নেই। যখন ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' পড়ি, ঠিক বুঝতে পারি নি বিমলার মনোভাবটা—নিখিলেশের মতো অমন স্বামী ছেড়ে সন্দীপের প্রেমে পড়ে কি জন্যে। আজ বুঝছি—তার তবু সংগত অনেক কারণ ছিল, আরও নীচ প্রবৃত্তি তোমাদের—এই জাতের। যদি সম্ভব হত, পৃথিবীতে এমন দেশ থাকত যেখানে মেয়েছেলে নেই, সেখানেই ছেলেকে নিয়ে চলে যেতুম। যাতে জ্ঞান হয়ে আর এই জীবের মুখ না দেখতে পারে, তোমাদের খপ্পরে না পড়ে। পয়সা থাকলে একটা দ্বীপ কিনে নিয়ে সেখানে গিয়ে বাস করতুম।'

অধীর উত্তেজিত হয়ে উঠে পায়চারি শুরু করে প্রবীর।

ভাড়াটে বাড়ির ছোট ঘর, বিছানা পড়ে অন্য আসবাব রেখে পায়চারি করার মতো জায়গা অবশিষ্ট থাকে না বিশেষ, তাই আবার এসে সেই বিছানাতেই বসে পড়তে হয়।

কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত মন প্রবীরের, এইটুকুতেই সে কিছুটা সামলে নেয় নিজেকে, প্রাণপণ চেষ্টাতেই সংযত করে।

কণ্ঠের প্রায়-উদ্‌গত প্রচণ্ড বিষ দমন করে।

ফলে খানিকটা চুপ করে থেকে আবার যখন কথা বলে, তখন পূর্বের তিক্ততা আর খুব বেশী বোঝা যায় না, তবে আরও শাণিত আরও ক্ষুরধার মনে হয় তার সেই আপাত-শান্ত কণ্ঠ।

বলে, 'না বিজয়া, এখানে আর তোমার স্থান হওয়া সম্ভব নয়। অন্য যে-কোন লোকের ক্ষেত্রে হয়ত আমি কিছুটা বিবেচনা করতুম কিন্তু ঐ

জানোয়ারটার—ঐ স্কাউণ্ড্রেলটার উচ্ছিষ্ট নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না। আমাকে তুমি—এ আমার চরম অপমান। আমার মনুষ্যত্বে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কিছু হতে পারে না, তুমি যে আঘাত দিলে। এর পর সে লোকটা জানতে পারলে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসবে, মনে করতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে, ঐ ছেলেটাকে—সকলকে খুন করে এ বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিই। না, তুমি যাও বিজয়া। যেখানে খুশি চলে যাও। বেশী টাকা ঘরে নেই, যা আছে দেরাজ খুলে সব নিয়ে যাও। আরও পারলে আরও দিতুম কিন্তু আমারও আর বেশী কিছু নেই কোথাও। এ বাড়ি, এ পাড়াও আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। চেষ্টা করব—এ শহরটাই ছাড়তে—নইলে হয়ত একদিন সত্যিই আত্মহত্যা করতে হবে! কাজেই সেও কিছুদিন যোঝবার মতো টাকা চাই। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বৌদির কাছেই রেখে আসতে হবে খোকাকে—তাতে মরুক বা বাঁচুক।...যাকগে সে খবরে তোমার দরকার নেই। আমি বাইরের রকে গিয়ে বসছি। আশা করব—সকাল হওয়ার আগেই, খোকা ঘুমোতে ঘুমোতে, তুমি সব গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারবে। একটা রিক্শা নিয়ে শ্রীধরের কাছে চলে যাও কিংবা সেই তার কাছে গিয়েই ওঠো, একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

এই বলে সন্তর্পণে দরজা খুলে, সত্যি সত্যিই বাইরের রকে গিয়ে বসে প্রবীর।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতেও পারে না।

কখনও উঠে পায়চারি করে, কখনও আবার হতাশ হয়ে ক্লান্তভাবে এসে বসে পড়ে।

বহু সমস্যা সামনে। রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য প্রশ্ন শুরু হয়ে যাবে। কোথায় গেল সে, কেন গেল—জনে জনে এই প্রশ্নই

করবে।

প্রশ্ন করবে ছেলেও।

এখান থেকে চলে যেতে হবে তো বটেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। ঠিক একদিনেই তো হবে না।

এক, কটা দিন কলকাতার কোন হোটেলে গিয়ে থাকলে হয়—কিন্তু সেখানে খোকাকে কে দেখবে!

সে কিন্তু ওকে নিয়ে আটকে থাকতে পারবে না।

অথচ এধারে ইস্কুল আছে, যে প্রকাশকদের কাজ করে তাদের কিছু কিছু জরুরী কাজ আছে।

যে দায়িত্ব সে নিয়েছে, যে কাজ করেই খেতে হবে হয়ত সারা জীবন—সে কাজ সে দায় হঠাৎ ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

অন্তত খানিকটা বুঝ দিয়ে কিছু দিনের জন্যে বিদায় নিয়ে যেতে হবে।

বাচ্চাদের কোন হোস্টেল আছে কিনা, ঠিক এই বয়সের বাচ্চাদের—তাও জানে না।

থাকলেও হয়ত মিশনারীদের প্রতিষ্ঠানে সে ব্যবস্থা আছে। সেখানে অনেক খরচ।···

সাত পাঁচ দুশ্চিন্তার মধ্যেই সময় কেটে যায়। কোন কূলকিনারা পায় না যেন ভাবনার!

হঠাৎ একসময় শোনে ভেতরে তার ক্লক ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল।

ঘড়িটা প্রায় আধঘণ্টা স্লো। মানে সাড়ে চারটে বাজে।

চেয়ে দেখল যে আকাশও পাণ্ডুর হয়ে আসছে ক্রমশ, অর্থাৎ ভোরের আর দেরি নেই।

এতক্ষণে ওর খেয়াল হল যে সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ঘর থেকে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি।

যাবার সময় একটা কোন 'দৃশ্যে'র অবতারণা করে যাবে বিজয়া, এ তো

জানা কথাই।

অন্তত একটা প্রণাম করে যাবার চেষ্টা তো করবেই।

তার মানে এখনও ঘরেই বসে আছে।

কী আশায় বসে আছে সে ?

কিসের অপেক্ষায় ?

সে কি ভাবছে যে প্রবীর যা বলেছে কথার কথা ?

সাধারণ ভাবে রাগের মাথায় বলা ?

একটু পরে রাগ পড়লে আবার সহজ স্বাভাবিকভাবে ঘরকন্না করবে ? বড় জোর আর একবার ক্ষমা-প্রার্থনার অভিনয় করবে বিজয়া— ব্যস, তাহলেই সব চুকে যাবে ?

তা হলেই সে চিনেছে প্রবীরকে !

ওদের যা মান-অপমান জ্ঞান, ওদের যা প্রবৃত্তি, সেই মতোই হিসেব করেছে অবশ্য।

ওদের দোষ কি, এই রকমই গঠন ওদের মনের।

নইলে ঐ লোকটাকে, যাকে দেখলেই ঘেন্না করে— ছোটলোক বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমনি যার চেহারা আর বেশভূষা— তার সঙ্গে ভদ্র-ঘরের সুশ্রী কুমারী মেয়ে বেরিয়ে আসে, তার লাথি খেয়েও তার ঘর করে।

একেবারে তাড়িয়ে দিতে তবে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয়েছে।

তাও মরতে পারে নি।

কে জানে, এখনও তাকেই ভালবাসে হয়ত মনে মনে।

ওর প্রতি অনুরাগ সবটাই অভিনয়।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই যেন একটা বিষের জ্বালা অনুভব করে প্রবীর সর্বাঙ্গে।

ছটফট করে উঠে পড়ে সে।

এর প্রতিকার একটা এখনই করা দরকার।

ঐ স্বৈরিণী অভিনেত্রী মেয়েমানুষটাকে এখনই বার করে দিতে হবে—কেউ ওঠার আগে।

সহজে না যেতে চায় জোর করেই বার করে দেবে।

ওর সেই সোহাগের প্রণয়ীর মতো।

আর না, আর কোনমতেই কোমল হবে না সে, ভদ্র সংস্কার যখন কেউ রাখতে দেবেই না—তখন সে চেষ্টা করেই বা লাভ কি!

আবারও একটা দুঃসহ ক্রোধ অনুভব করে সে।

কতকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢোকে।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই একটা প্রবল ধাক্কা খায়।

কেউ নেই ঘরে। খোকা ছাড়া।

পাশের ছোট বিছানাটায় সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে এখনও।

এ পাশের বিছানা, সারা ঘরটাই খালি।

কাল গরম বেশী ছিল বলে মশারি ফেলতে দেয় নি, শুধু খোকার মশারি-টাই ফেলা ছিল।

দেখতে কোন অসুবিধা নেই—কোথাও আড়ালে বা কোন কোণে—খাঁজে লুকিয়ে থাকবে, সে সম্ভাবনাও নেই।

আর একটু ভাল করে চেয়ে—খোকার বিছানার ধারে এসে আরও একটা জিনিস নজরে পড়ল ওর।

কিছুই বিশেষ অবশ্য ছিল না বিজয়ার, বিয়ের সময় দুগাছা হাঙরমুখো পালিশের বালা ও ছ' গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছিল—মার একটা হার ছিল সেটাও দিয়েছিল একটু পালিশ করিয়ে—সে সমস্তগুলোই খুলে খোকার মাথার কাছে রেখে গেছে সে, হাতের লোহা ও শাঁখা ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় নি।

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একবার আলনার দিকে চায়।

না সব কাপড় জামা সায়াই থরে থরে সাজানো আছে। আস্তে আস্তে আলমারিটা খুলে দেখে, সেখান থেকেও কিছু নেয় নি।

ড্রয়ার খুলে মোটামুটি টাকার জায়গাটা খুঁজে দেখে—যা ছিল তা-ই আছে বলে মনে হয়।

গোনা-গাঁথা নেই ঠিক—তবু কিছু নিলে বুঝতে পারত।

এক যদি এক-আধটা টাকা নিয়ে থাকে সে কথা আলাদা।

না, কিছুই যে নেয় নি, সে এক-আধটা টাকা নেবে তা সম্ভব নয়!

এক বস্ত্রে, সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থাতেই গেছে।

বুকটার ভেতর অকস্মাৎ যেন বড় খালি খালি ঠেকে ওর।

বোধকরি এতখানি শূন্যতা সুনেত্রা চলে যেতেও বোধ করে নি সে।

একটা অবুঝ অভিমানও বোধ করে যেন। একবার বলে গেল না যাবার সময়!

ঘরদোর এমনি খালি ফেলে রেখে চলে গেল!

একটা প্রণাম করে যাওয়াও উচিত ছিল না অন্তত?

তারপরই মনে হলো—ওর যা মানসিক গঠন, অন্যায় ও কারও ওপরেই করতে পারে না বেশীক্ষণ—প্রণাম করতে এলে সেটাকেও অভিনয়ই ভাবত।

'ভোরে উঠে না দেখতে পাই' এই কথাই বলেছিল ও, বেশ স্পষ্ট ভাষায়। তাই মুখ না দেখিয়ে যদি অন্ধকারে নিঃশব্দে চলে গিয়ে থাকে তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

ভোরের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলমারির বড় আয়নাটায় নিজের প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বুকের জায়গায় সিঁদুরের দাগ।

দাগ নয় ঠিক, খানিকটা জায়গা জুড়েই যেন লেপে গেছে সিঁদুরটা।

গাঢ় আলিঙ্গনে চেপে ধরেছিল যখন বিজয়াকে—তখনই এটা লেগে থাকবে।

ঘাম হচ্ছিল খুব ওরও, বিজয়ারও। তাতেই বিজয়ার কপালের ফোঁটাটা গলে বুকের অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে নিশ্চয়।

হয়ত এমনিভাবে তারও কপালটাময় মাখামাখি হয়ে গেছে।

কোন সধবা মারা গেলে যেমন তার কপালময় সিঁদুর লেপে দেয়—তেমনি।

ঐভাবে পথে বেরোল কি করে?

অত লক্ষ্য করে নি হয়ত অন্ধকারে—কিন্তু দিনের আলোয় যখন লোকে দেখবে তখন তারা কি মনে করবে?

ভাবতে ভাবতেই ধ্বক করে যেন একটা আঘাত লাগে বুকের মধ্যে।

মরা সধবার কপালে যেমন—!

এমন একবস্ত্রে সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থায় একটি পয়সাও না নিয়ে গেল কোথায়?

মরতেই গেল না তো?

অন্য কোথাও গেলে অন্তত দু' চারটে টাকাও কি নিয়ে যেত না?

একখানা কাপড় অন্তত? ওর সেই আগের মনিবরা বিয়ের কথা শুনে যে শাড়িখানা দিয়েছিলেন সেটা তো সামনেই ছিল—সেটাও তো নিতে পারত।

এভাবে আর কোথায় যেতে পারে?

চারিদিকে আর একবার যেন খুব অসহায়ভাবে চোখ বুলোয়।

তার হাতেই সাজানো।

পরিপাটি করে গোছানো, বেশ যত্ন করে।

তার আগ্রহ তার আন্তরিকতা—সংসারে প্রবল আসক্তির চিহ্ন সর্বত্র, সমস্ত জিনিসে তার সেই মমতাময় হাতেব স্পর্শ।

বহুদিন এমন আরাম পায় নি প্রবীর।

জ্ঞান হবার থেকে কখনই পেয়েছে বলে মনে পড়ে না।

মা একা এক-হাতে বেশী কিছু পেরে উঠতেন না।

বৌদি ছিলেন অকর্মণ্য, আয়েসী।

তিনি তো নিজের জিনিসগুলোও গুছিয়ে রাখতে পারতেন না।

বিজয়ার সেবা যত্ন, সংসারে তার উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রবীরের শুষ্কচিত্তেও যেন নতুন জীবনের জোয়ার এনে দিয়েছিল।

নতুন করে খাটবার, বেশী করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করার প্রেরণা পেয়েছিল সে।

সুনেত্রার মতো বিরক্ত হত না বিজয়া। রাত্রে প্রুফ দেখতে বসলে, বরং কলমগুলো পরিষ্কার করে কালি ভরে গুছিয়ে দিত, পাখার হাওয়ায় কাগজ উড়ে যায় বলে, পিছন থেকে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে পিঠে বাতাস করত—

না, না, একি হল তার!

প্রথমে যে একটু সুখের মুখ দেখেছিল—সেই সুখের উৎস নিজে থেকেই রুদ্ধ করে দিল সে!

বিজয়াকে বাদ দিয়ে আবার সেই মরুভূমি-তুল্য জীবন যাপন করা!

অসংখ্য সমস্যা-সংকুল, দুঃখময়!

লোককেই বা কি বলবে সে?

মুখ দেখাবে কেমন করে?

আজই তো কোথাও চলে যেতে পারে না—কাউকে কিছু না বলে।

না, না, এ সম্ভব নয়।

কেন গেল বিজয়া এমন ভাবে?

একটু অপেক্ষা করে যেতে পারল না।

মুখের কথা না হয় রাগের মাথায় বলেই ছিল প্রবীর, তাই বলে সত্যি সত্যি চলে গেল সে!

না, এ সম্ভব নয়। এত সহজে তাকে ছেড়ে দেবে না প্রবীর।

খোকা ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসল।

'মা, মা কোথায় বাবা?'

'মা—মা একটু গেছে এক জায়গায়। আমি তোমার মুখ ধুইয়ে দিচ্ছি, দুধ করে দিচ্ছি। ভয় কি। মা না-ই বা রইল।'

'না। তুমি না। তুমি বিচ্ছিরি মুখ ধোওয়াও। মা, আমি মার কাছে যাবো। মার কাছে যাবো আমি—মাকে ডাকো না—'

সে কান্না শুরু করে দেয়।

প্রবীরের মনে হলো ছেলের মতো তারও কাঁদতেই ইচ্ছা করছে।

কাঁদতে পেলে ভাল হত।

সত্যি কোথায় গেল সে?

নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এখুনি।

কোথায় আর যাবে?

কিন্তু—কিন্তু যদি সত্যিই মরতে গিয়ে থাকে?

যদি মরেই থাকে এর মধ্যে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা আর্তস্বর যেন বেরোয় মনের মধ্যে।

না, না, তা কি হয়? একটু অপেক্ষা করবে না অন্তত! প্রবীরের জন্যে না হোক, খোকা,—খোকাকে তো ভালবাসে সে—

সে আছেই।

প্রবীব এখনই খুঁজে আনবে তাকে।

কিন্তু কোথায় তাকে খোঁজে এখন?

গঙ্গার ঘাটগুলো খুঁজে দেখবে নাকি?

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল একটা কথা।

কালই বলেছিল সে—যখন ঐ লোফারটা তাড়িয়ে দেয় ওকে, তখন বার বার মনে হয়েছিল মরার কথা—গঙ্গায় ডুবে মরবে কিংবা রেলে গিয়ে কোন গাড়ির সামনে গলা দেবে।

জলে ডুবলে নাকি বড় কষ্ট হয়—রেলে গলা দিলে এক মুহূর্তেই সব শেষ

হয়ে যায়।

তবে কি সেই জন্যেই—?

খোকা কেঁদেই যাচ্ছে।

কোনমতে একটু চুপ করিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েই দরজাটায় শেকল লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রবীর। থাক সব পড়ে। বিজয়া যদি না ফেরে তারও কোন দরকার নেই এসব কিছুতে—

'এই রিক্‌শা—রোকো রোকো—চলো—বেলিয়াঘাটা টিশ্যন—' খোকাকে নিয়েই চড়ে বসল সে, 'এই যে বাবা, মার কাছে যাচ্ছি তোমার।'

কেন যে বেলেঘাটা স্টেশনের কথাটা মনে পড়ল, তা সে জানে না।

হয়ত ঐটের কাছে বলে।

হয়ত ষষ্ঠানুভূতি—

বেলেঘাটা পৌঁছেও প্রথমটা খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কী করবে, কী ভাবে খোঁজ করবে, এক্ষেত্রে কী ভাবে খোঁজ করা নিয়ম—কিছুই জানে না।

একবার ভাবলে রেল পুলিশকে জানায়, কিন্তু সে বড় বেশী জবাবদিহি, বেশী জানাজানি।

পায়ে পায়ে একটা প্ল্যাটফর্মের দিকেই এগিয়ে গেল সে।

দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।

একখানা ট্রেনই তখন ছাড়ছে ঐ প্ল্যাটফর্মটা থেকে।

কোন শান্টিংয়েরও কাজ হচ্ছে না কোথাও।

অত সকালে খুব বেশী যাত্রী বা সব্‌জীওলার ভিড় নেই। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তাই।

ভাল করে ঘাড় উঁচু করে চেয়ে দেখল।

ঐ তো, প্ল্যাটফর্মের শেষে ঢালু জায়গাটায় কে একটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছে না—স্থির হয়ে?—

একখানা হেলিওট্রোপ রঙের শাড়ি পরা—কাল বিজয়াও তো রাত্রে ঐ

রঙের কাপড়ই পরেছিল।

সে দ্রুত এগিয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়ার খুব বেশী দেরি নেই। প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে।

বিজয়া এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এদের দেখতে পায় নি।

কিন্তু একেবারে কাছে গিয়ে পড়তেই খোকা চিনতে পেরেছে।

সে 'মা' বলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল---এবং প্রবীরের কোলের মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠল নেমে মার কাছে ছুটে যাবার জন্যে।

বিজয়া চমকে এদিকে ফিরল।

তার মুখ অপরিসীম শুষ্ক, ম্লান, দুই চোখে রোদনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

প্রবীর কাছে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে লাইনের পাশ থেকে এদিকে টেনে এনে বলল, 'খোকাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিলে ? ওকে কে দেখবে ? যেতে হয় ওকেও নিয়ে যাও।'

ততক্ষণে খোকা ঝাঁপিয়ে বিজয়ার কোলে গিয়ে পড়েছে। সে অস্ফুট কণ্ঠে 'ষাট' 'ষাট' করে ছেলেকে বুকে চেপে ধরল কিন্তু সামলাতে পারল না। এতক্ষণের হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্বে যেন ডুকরেই কেঁদে উঠল আবার।

'চুপ করো চুপ করো। লক্ষ্মীটি। ঘরে চলো। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিছল কি বলতে কি বলেছি। তুমি তো আমাকে জানো। তুমি আমাকে মাপ করো। তুমিই আমার যথার্থ স্ত্রী, আমার মাথার মণি। একবার তুমি নিজে যেচে আমার ঘরে গিছলে- আজ আমি তোমাকে মাথায় করে নিয়ে যেতে এসেছি—'

খোকা মার মুখটা নিজের দিকে জোর করে ফিরিয়ে বললে, 'মা বাড়ি চ, ক্ষিদে —'

প্রায় মাসখানেক পরে বিজয়া সাহস করে কথাটা পাড়ল প্রবীরের কাছে।

'একটা কথা বলব ? রাগ করবে না ?'

'আবার কি কথা। কথা শুনলেই যে ভয় করে।'

'না গো না, এ তেমন ভয়ানক কিছু নয়। খুব ছোট্ট একটা ভিক্ষে তোমার কাছে—'

'অত ভণিতা করছ কেন। তাতেই যে আমার ভয় হচ্ছে। কী ব্যাপার বলো তো?'

বিজয়া প্রবীরের বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'তুমি—তুমি ওকে ক্ষমা করো—সুনেত্রাকে। ও বড় দুঃখী। আর অনুতপ্তও। ছেলেকে একটু দেখতে চায় মাঝে মাঝে—এ পাড়ায় নয়, না হয় অন্য কোথাও গিয়েই দেখাবো—তুমি মত দাও—'

প্রবীর যেন নিমেষে কঠিন হয়ে ওঠে।

ভেতরে শুধু নয়—বাইরেও।

সেই রূপান্তরটা বুকের-মধ্যে-মিশিয়ে-থাকা বিজয়ার টের পেতে দেরি হয় না।

বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে প্রবীর বলল, 'না, সে হবে না। সে কাজ করতে যেয়ো না বিজয়া। আমি তোমাকে আবার নিষেধ করছি। খোকা তোমাকে তার মা বলে জেনেছে, তাই জানুক, অন্য মা-তে দরকার নেই। খুব অসুবিধেয় পড়ে থাকে—তাকে আমি মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা করে দিতে রাজী আছি। কোথাও থেকে পড়াশুনো করে পরীক্ষা দিক। তার পর চাকরির চেষ্টা করুক। আমি বরং শ্রীধরের নামে টাকাটা পাঠাব মনিঅর্ডার করে।...কিন্তু এখানে যেন সে কোনক্রমেই না আসে আর। তুমিও তার সঙ্গে দেখাশুনো করো, এটাও আমি পছন্দ করি না।...নতুন জীবন শুরু হয়েছে তোমার—পুরনোর দিকে আর তাকিয়ো না।'

ভোরে এসে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুনেত্রা। সেই রকমই কথা ছিল

ওদের। বিজয়া গিয়ে প্রবীরের রায় জানিয়ে সজল চোখে দুই হাত জোড় করল, 'আমি ওঁর অবাধ্য হতে চাইনে ভাই, অবস্থা বুঝে আমাকে মাপ করো।'

'না না, দরকার নেই। অনেক দুঃখ আমি ওঁকে দিয়েছি, আর দিতে চাই না। তোমরা সুখী হও, সুখে থাকো। ওঁকে সুখী করো—এই-ই আমার যথেষ্ট। ছেলে তোমার কাছে ভাল থাকবে তা আমি জানি।…আচ্ছা, আমি যাই ভাই। আর তো দেখা হবে না বোধহয়। আমার কথা ভুলে যাস, সে-ই ভাল।'

'তা হলে টাকাটা—কী বলব ওঁকে?'

'না, টাকা পাঠাতে হবে না। আর কোন সম্পর্ক না রাখাই ভাল। এই কথাই বলে দিস ওঁকে। যদি উনি রাগ না করেন—আমার একটা প্রণাম জানাস।'

দ্রুত সেখানে থেকে চলে যায় সুনেত্রা।

চলে যায় ওদের জীবন থেকেই, চিরকালের মতো।